উত্তর পুরুষ

আশাপূর্ণা দেবী

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ '৫৯ / নভেম্বর '৫২

প্রকাশিকা :
লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
জি. শীল / ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৭০০০০৫

যে সময় পৃথিবীপ্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাক খাচ্ছে, কেজো লোকেরা জেট প্লেনকেও যথেষ্ট দ্রুতগামী বলে মনে করছে না, এবং বিজ্ঞানের নিত্যনতুন অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য সব আবিষ্কার মুহূর্তে মুহূর্তে বাসি খবরের কাগজের মত অনাকর্ষণীয় হয়ে যাচ্ছে, তেমন সময়ে নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরীকে নিয়ে গল্প লেখা মানায় কিনা ভাববার কথা।

নিখিলেন্দ্র যদি যথাসময়ে মারা যেতেন তা হলেও না হয় ওঁর গল্পটাকে আশ-পাশের কারো স্মৃতিকথার মাধ্যমে একটা ঐতিহাসিক গোছের রূপ দেওয়া যেত। লোকটার বাপ-ঠাকুর্দার পর্যন্ত যখন 'রাজা' উপাধি ছিল।

কিন্তু সে সুবিধে পা

আছে।

যদিও ভঞ্জচৌধুরী বং

ফসিল হয়ে গিয়ে জায়গা জু

বলে ওই লোকটার

পুরনো নামী পাড়ায় পুরনো

বাড়িটা একদা সত্যিই দামী ছিল আর পাড়াটা সমীহের ছিল।

এখন আর সে পাড়া আকর্ষণীয় অভিজাত নয়, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঝিমঝিমে সেই পুরনো 'সাহেব পাড়ায়' এখন আর নতুন কোন বাড়ি উঠতে দেখা যায় না, অতএব দেখা যায় না নতুন কোন প্রতিবেশী। আশে-পাশে যারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, অনেকটা অনেকটা দূরত্বে,

তাদের অধিকাংশই 'অ্যাংলো', বাকিরা ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের কিছু কিছু নমুনা।

ভঞ্জচৌধুরী বংশের কারো সঙ্গে ওদের চেনা-জানা নেই, পথে বেরিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে, দাঁড়িয়ে পড়ে বাজে ভদ্রতার কুশল প্রশ্নের দায় কোন পক্ষেরই নেই। মুখোমুখি হলেও চোখাচোখি হয় না। যদি কারো হাতে কুকুরের গলায় বাঁধা চেন থাকে, সে বড়জোর চেনটা টেনে নিয়ে কুকুরটাকে সরিয়ে নেবে সামনের লোকের পথ করে দিতে। বেশীর ভাগ হয়ত নেপালী চাকর আর ভুটানি আয়া। ...আসল বাসিন্দাদের দৈবাৎ দেখা যায়, কে যে কখন আসে যায়, কী করে না করে বোঝা শক্ত!

তবু এ পাড়ারই এক বিবর্ণ দেওয়াল আর রংজ্বলা জানলাওয়ালা বাড়ির মধ্যে বসে ওরা নাক তুলে বলে, 'ফসিল! স্রেফ ফসিল হয়ে গেছে লোকটা!'

তাই না নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরীকে নিয়ে গল্প লেখায় মানানো না মানানোর প্রশ্ন।...এখন এই উত্তাল কালে,—যখন মহাকাশে মানুষের হাতে গড়া উপগ্রহ পাক খাচ্ছে, তখন ওই লোকটাকে 'জ্যান্ত মানুষ' বলে মনে করানো যাবে, নাকি যাদুঘরে রেখে দেবার যোগ্য মাটি খুঁড়ে বার করা পুতুল বলে মনে হবে কে জানে।

তবু সেকেলে জোব্বা জাব্বা জামার মত ওই জোব্বা জাব্বা নামওয়ালা মানুষটার গল্প আমায় লিখতেই হচ্ছে।...কারণ উত্তরবঙ্গের এক প্রান্তে ঘন অরণ্যাণীর প্রাচীর-ঘেরা অরণ্যক্রোড়ের ওই শহরটায় গিয়ে পড়লে, আর ভঞ্জচৌধুরীদের মরাহাতীর মত প্রাসাদটার মধ্যে উঁকি মারলে দেখা যাবে, মানুষটা দস্তুরমত 'আছেন।'

ওঁর ওই নাতিরা—মনুজ অম্বুজ আর দনুজ, যারা অনাবশ্যক বোধে সাবেকী কালের বহু নীতি নিয়ম আচার-আচরণের মত নিজেদের নামেরও খানিকটা বর্জন করে হাল্কা করে নিয়ে স্বচ্ছন্দ

হয়েছে, তাদের থেকে অনেক বেশী পরিমাণেই আছেন নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরী।

*

বিরাশী বছরের শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের হাওয়ায় 'সীজন' হয়ে যাওয়া সতেজ মজবুত দেহটা নিয়ে সোজা খাড়া আছেন। যেমন খাড়া আছে ওই 'রাজবাগানে'র আকাশে মাথা তোলা 'পাম' গাছগুলো।

হ্যাঁ, এ অঞ্চলে ভঞ্জচৌধুরীদের বাগানকে লোকে 'রাজবাগানই' বলত। এখনও বলে, পুরনো গাড়োয়ানরা, বুড়ো মিস্ত্রীরা, নুয়ে-পড়া দর্জিরা। তা নতুন বাসিন্দারাও বলে, ওদের শুনে শুনে। এ অঞ্চলের কোন কোন বনেদী বাসিন্দারাও নাতি-পুতির কাছে গল্প করতে বসে বলে, 'আরে তখন কী শোভা ছিল ওই বাগানের তা যদি দেখতিস! আমাদের ছেলেবেলায় ওটা একটা দ্রষ্টব্য জায়গা ছিল, সাহেবসুবোরা দেখতে যেত। সাহেবসুবো নিয়েই তো দহরম-মহরম ছিল ওনাদের। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলে ওঁদের গেস্ট হাউসেই উঠতেন। আমরা ইস্কুল থেকে বেরিয়ে দল বেঁধে ওই রাজবাগান দেখতে যেতাম। তা মালি দারোয়ানরা কি ঢুকতে দিত? ঘেরা রেলিঙের ফাঁকে ফাঁকে চোখ ফেলে যেটুকু দেখা যায়।'

*　　*

তা সে সব কিংবদন্তী হয়ে গেছে, বাগানের সেই অতীত শোভা আর নেই। কৃত্রিম পাহাড়গুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত, কৃত্রিম ঝিলটি মজে যাওয়া ডোবা পুকুরের মত মশার বংশবিস্তারের লীলাক্ষেত্র, মাথাভাঙা শুকনো ফোয়ারার মরচে-পড়া দেহগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন কালের প্রহরীর মত।

তবু এখনো এ শহরের 'দ্রষ্টব্যে'র খাতায় রাজবাগান নামটা টিঁকে নেই তা নয়। এমন কি বহিরাগত ভ্রমণকারীরা সাইকেল রিকশা চালিয়ে শহরটা চষে বেড়াবার সময় দেখেও যায় একবার কৌতূহল নিয়ে।

ওই রিকশাওয়ালারা যদি বুড়ো হয়, যারা আগে হয়ত ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ছিল, তারা ওই রাজবাড়ি আর রাজবাগানের জানা অজানা নানা কাহিনীকে রঙে রাংতায় মুড়ে তার সওয়ারিকে উপহার দেয়, আর জানিয়ে দেয়, 'বুড়ো মালিক আছে এখনো ওর মধ্যে।' বাগান দেখতে আগে 'পাশ' লাগত, আর এখন এই অবস্থা!

এখনকার অবস্থা এই, দারোয়ান নামের কেউ একজন থাকলেও, গেট সর্বদাই জনশূন্য। তোমার সাহস না থাকলে বন্ধ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে বল. 'দূর, দেখবার আর কি আছে?'···আর সাহস থাকলে মরচেপড়া ভারী গেটটা ঠেলে ঢুকে পড়। কোন সময় কেউই কিছু বলবে না, হয়ত গোল করে ঘেরা বেদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো ঝাউগাছগুলো বাতাসে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাকিয়ে কিছু বলতে চাইবে, আর নয়ত বা কদাচ কোনোদিন গেট খোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে পিঠকুজো একটা বুড়ো কোনখান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসবে ভুঁইফোড়ের মত।

ও আর এখন 'পাশ' দেখতে চায় না, যা চায় তা পেলেই লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে নিজের কাজে চলে যায়।···

তারপর তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে পুরনো বড়লোকদের অমিতাচারের নিন্দাবাদ কর, পুরনো সৌন্দর্যের হিসেব কর, আর ডানাভাঙা পরীদের ব্যাখ্যানা কর, কেউ শুনতে আসবে না।

বাগান থেকে চোখ তুলে প্রাসাদের এক কোণের বারান্দাটা দেখা যায়, কৌতূহলীরা চোখ তুলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যদি হঠাৎ ওখানে কেউ বেরিয়ে আসে।

কেউ আসে না। এদিকটা পরিত্যক্ত। কিন্তু হঠাৎ আসবেই বা কে? নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরী কি 'হঠাৎ' কোন কিছুই করেন? তাঁর গতিছন্দ তো নিয়মের চাকায় বাঁধা। তিনি বারান্দাটায় বেরোন ঘড়ির কাঁটার অবস্থান দেখে।

দক্ষিণের বারান্দার জন্যে একটা টাইম বাঁধা, পূব বারান্দার জন্যে আর একটা। পশ্চিমটা আছে রাতের জন্যে। উত্তরটা পরিত্যক্ত, সেদিকে বাগান। কাজেই চোখ তুলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেলেও ওই টানা লম্বা চওড়া বিরাট বারান্দায় কাউকেই দেখতে পাওয়া যায় না।

আজকের দুপুরেও এই রকম কেউরা দেখছিল। তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে। অথবা বেশী প্রাঞ্জল করতে গেলে বলতে হয় তিনটি তরুণ ও একটি তরুণী।

গোটা তিন-চার ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন দৃশ্য এখন আর আশ্চর্যের নয়। এই মফস্বল শহরটাতেও এ দৃশ্য দেখে চমকে ভুরু তুলবে এমন চোখ ভুরু আর নেই। তাই ওই তিন আর একে চারজন স্টেশনে নেমে পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চরে বেড়াচ্ছে। দুখানা সাইকেল রিকশা নিয়ে ঘুরছে টো টো করে, খেয়েছে যা হোক একটা হোটেলে, এবং খাওয়ার পরই আবার অভিযানে বেরিয়েছে।

রাজবাগানের খবর রিকশাওলাই দিয়েছে।

গেটের বাইরে থেকে বেশ কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মেরে ওদের ম মেয়েটা সাহস দেখিয়ে বলে উঠল, 'গেটে তো আর তালা লাগ নেই, এত ভয় কিসের? ঠেলে ঢুকে পড়লে কি হয়?'

একটা ছেলে বলল, 'তুমি ঢুকলে তোমার কি হবে জানি ম্যাডাম, আমরা ঢুকলে—তক্ষুণি হায়, যমদূত প্রায় কোথা হতে এসে মালি, পাড়িতে লাগিবে গালি।'

মেয়েটা ঠোঁট উল্টে ঠোঁটের একটা অপরূপ ভঙ্গী করে বলল, 'মালি? তার তো ছায়াও দেখছি না। স্রেফ বেওয়ারিশের মতন পড়ে আছে দেখছ না?'

'দেখছি, কিন্তু গেট ডিঙোলে তদ্দণ্ডে মাটি ফুঁড়ে ওয়ারিশানের আবির্ভাব হতে পারে।'

'এই স্বদেশটা একটা কাওয়ার্ড? আমি ঢুকছি, শুধু তোমরা কেউ গেটটা একটু ঠেলে দাও।'

বলা ছাড়া গতি ছিল না।

সেই বিরাট ভারী আর উঁচু গেটটা ঠেলে সরাবার ক্ষমতা ওই ফরফুরে মেয়েটার নেই।

দ্বিতীয়জন বলল, 'তার চেয়ে রিকশাওলাটাকেই তো জিগ্যেস করলে হয়, ভেতরে ঢোকা বারণ না অ-বারণ।'

'এই তুমি নন্দন, তুমিও একটি রাম কাপুরুষ!' বলে মেয়েটা পাশের দিকে সরে এসে ছায়ায় বসে-থাকা রিকশাওলাদের জিগ্যেস করে কথাটা।

বুড়ো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলে, 'এখন আর বারণ কিছু নেই দিদিমণি, ওই দারোয়ান বুড়োকে আট আনা এক টাকা করে দিলেই খুশী হয়ে যাবে।'

মেয়েটা তার বাঁকা ভুরুর ভঙ্গিমা বৃথা অপচয় করে বলে ওঠে, 'দারোয়ান? সে আবার কোথায়?'

'আছে! ভেতরে হবে, মালিই এখন দারোয়ান।'

বলে লোকটা এগিয়ে এসে গেটটাকে প্রাণপণে ঠেলে সরিয়ে ভিতরে কোথায় যেন ঢুকে যায়, আর প্রায় পরক্ষণেই একটি 'টাইট' চেহারার বুড়ো মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে এসে বলে, 'এই যে কাসেম আলীসাহেব, ইনিই হচ্ছেন এখানের কেয়ারটেকার। খাওয়া দাওয়া করছিলেন, তাই—'

'তাই' মানে বুঝতে হবে, তাই—কর্তব্যে কিছু গলতি ঘটেছে, এখানে মোতায়েন থাকতে পারেন নি। ছেঁড়া ফতুয়া আর ময়লা লুঙ্গি পরা এই লোকটাকে এত খাতির করার নিহিত অর্থ কিছু থাকাই স্বাভাবিক। এরা চোখে চোখে ইসারা খেলিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকায়। মেয়েটা তার ভ্যানিটি ব্যাগ দোলাতে

দোলাতে অপরাধীর সুরে বলে, 'আহাহা' তাহলে তো আমাদের ভারী অন্যায় হয়ে গেল, সাহেবের খাওয়া হল না।'

'না না, ও কিছু না। ও হয়ে গেছে।' আ-নাভি শাদা দাড়ি ঝোলানো বুড়ো উৎসাহের গলায় বলে, 'কলকেতা থেকে আসা হয়েছে? না মালদা?'

মালদাটা বোধ করি এদের হিসেবে সদর শহর, তাই এই প্রশ্ন।

এখন তো আর পোশাক দেখলে বোঝবার উপায় নেই এরা খাশ কলকাতার না অজ মফস্বলের। একটা টেরিকট প্যান্ট আর টেরিলিন শার্ট, শহর মফস্বলকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। আর মেয়েদের গেঁথেছে প্রিন্টেড শাড়ি, আসমুদ্র হিমাচল ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ওই এক খোলশে ঢুকে পড়েছে।

তবু জিগ্যেস করল মাননীয় কাসেম আলীসাহেব।

'কলকাতা থেকে', সংক্ষেপে এইটুকু জানিয়ে মেয়েটি সোৎসাহে ওই ধ্বংসপ্রায় নিদর্শনগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, 'তুমি অনেক দিনের লোক না?'

রিকশাওলা আরো সোৎসাহে বলে, 'আজ্ঞে তা আর বলতে! আমারই তো আজ এখেনে চল্লিশ বছর কেটে গেল দিদিমণি! তখন থেকেই দেখছি। তখন এ বাগানের কী শোভা!...আলীসাহেব, এনাদের ভাল করে সব দেখিয়ে দাও। উই ওধারে যে পাহাড় আছে, লেক আছে, শিবমন্দির আছে—'

'শিবমন্দির?—'

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, 'বাগানে মন্দির কেন?'

কাসেম আলী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, ও একটা কাহিনী। ওই শিবঠাকুরটা রাজবাড়ির মধ্যে ছিল, তো একবার একটা ম্যাজিস্টেট সাহেব 'এ কোন চীজ' বলে ওই ঘরে ঢুকে পড়েছিল, তাই ওই

ঠাকুরটার জাত গেল। ওকে বাগানে এনে রাখা হল। তখন রাণীমা বলল, 'রোদ হবে জল হবে, ঠাকুরটার মাথায় লাগবে, মন্দির একটা বানিয়ে দেওয়া হোক।'

ঠাকুরটার জাত গেল শুনে মেয়েটা কষ্টে হাসি গোপন করল, কিন্তু ছেলেগুলো তো হো হো করে হেসে উঠল।

মেয়েটা চাপা গলায় বলল, 'অসভ্যের মত হাসছো কেন? দেখো ও আর মুখ খুলবে না।'

তা ওর যে এই বয়েসেই মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে, তা বোঝা গেল। সাহেব তৎক্ষণাৎ ব্যাজার মুখে বলল, 'এখন আর দেখার কিছু নেই, যা দেখবেন দেখুন। যাবার সময় বলে যাবেন, গেট বন্ধ করব।'

'গেট বন্ধ' করার কথাটা ইসারা।

আগে গেট বন্ধ ছিল না।

এদের চারজনের হাত থেকে চারটে টাকা বেরিয়ে এল, 'আচ্ছা সাহেব, তুমি বিশ্রাম করগে, বুড়োমানুষ! আমরা বন্ধ করে দিয়ে যাব।'

চার চারটে টাকা!

এটা অপ্রত্যাশিত বৈকি!

সেই সে যুগে—যখন কাসেম আলী নামক একটা জোয়ান ছেলে এই বাগানের মধ্যবর্তি 'লন'টাকে ঠিক রাখতে কেবলমাত্র ঘাস ছাঁটার কাজ করত, তখন বখশীস পেয়েছে একসঙ্গে পাঁচ দশ। সে এখন ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার মত ফোতো টাকা নয়, আসল রুপোর বাজনদার টাকা।

অতিথি অভ্যাগত দেখলেই কাসেমের কর্তব্যানষ্ঠা আরো বেড়ে উঠত, আর সেই নিষ্ঠা দর্শনে প্রীত এবং নিজের দিলদরিয়া মেজাজ দেখাতে উৎসুক অতিথিরও হাত পকেটে ঢুকত, বেরুত।

কাসেম আলীর সে সব দিন আজ স্বপ্নের মত। কাসেমের নিজের সেই সা-জোয়ান চেহারাটা যেমন আস্তে আস্তে বদলাতে বদলাতে এইখানে এসে পৌঁছেছে, বাগানটারও তাই।

এখন কাসেম আলী আট আনা এক টাকার বেশী প্রত্যাশা করে না। তাই বা ক'জন দেয়? রেলিংয়ের বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখেই তো চলে যায়। আর দিলে—যত বড় দলই আসুক, সাতজন আটজন দশজনের, বখশীসটা একজনের হাত থেকেই পড়ে।

নগদ চার টাকা পেয়ে কাসেম আলীর মরা মাছের মত চোখ দুটোও যেন চকচক করে উঠল। কাসেমের আর বিশ্রামের প্রয়োজন রইল না, মুখ খুলেই গেল। টাকা কটা লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজে, শাদা চামরের মত দাড়িটায় হাত বুলিয়ে গভীর গলায় বলে উঠল, 'আর দাদাবাবু, এখন তো হরঘড়িই বিশ্রাম। হ্যাঁ, খাটুনি ছিল বটে এক সময়, আমার বাপজান আর আমি এই বাগানে খেটেছি, বাপজান বলেছে—এতে হবে না অ্যাসিসটেন্ট চাই, তক্ষুনি লোক এসে গেছে। তারপর বাপজান গেল, একা আমি। দেশ বিদেশ থেকে কত রকমের গাছ এনে রোয়া হত, তাদের খিদমদগারী তো কম নয়?···সে ছিল একটা দিন। সাহেব মেমরা গেস্ট হয়ে আসত, নাচগান খানাপিনার হর্‌রা হত, ওই সব ফোয়ারার জল ছেড়ে দিয়ে তাতে লাল নীল আলো ফেলা হত, ওই ঝিল-এ বোট ভাসত। সে সব দৃশ্যই আলাদা।··· চোখের সামনে কত দেখলাম। আবার সব শেষ হতেও দেখলাম, তবু এখনও এ বাগান ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না। 'মাটি'র দিন গুনছি, আর এক এক করে এদেরও 'মাটি' দেখছি। রাজাবাবু মাঝে মাঝে আদর করে বলেন, 'তুই আর কোথায় যাবি কাসেম, এই বাগানেই নিজের জন্যে একটা কবর খুঁড়ে রেখে দে—এন্তেকাল এলে গড়িয়ে গড়িয়ে তার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়বি, ব্যস।'

ছেলে তিনটে তখন এদিক ওদিক ঘুরতে শুরু করেছে, একটা

বুড়োর কাঁপা কাঁপা গলার বানানো বানানো কথা শোনবার সময় নেই তাদের।

স্বদেশ একটা শুকনো ফোয়ারার লোহায় ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল হাওয়া বাঁচিয়ে, বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'শিপ্রাটা ভাবছে, ওই 'মেহের আলী'র কথিত কাহিনী থেকে নতুন একটা ক্ষুধিত পাষাণ আবিষ্কার করবে। দাড়ি যাদু আমাদের মোটেই পাগলা মেহের আলী নয়। টাকা দেখে চোখ দুটো কী রকম জ্বলে উঠল দেখনি?'

'তা দেখলাম! এখন আবার নতুন গুল মেরে মেরে মেয়েটাকে ঘায়েল করে ফেলে আরো কিছু না খসায় ওর!'

ওদের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে, মেয়েটার নাম শিপ্রা আর ওদের আশঙ্কাও ভিত্তিহীন নয়। সত্যিই শিপ্রা আশায় উদ্বেল হচ্ছিল। এই শ্বেতশ্মশ্রু লোকটার মধ্যে থেকে হয়ত বেরিয়ে আসবে এক মেহের আলী।

তাই সে উৎসুক গলায় বলে, 'রাজাবাবু? রাজাবাবু কেউ আছে না কি এখনও?'

কাসেম আলী আবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে উচ্চাঙ্গের গলায় বলে, 'আছেন বৈকি। এই কাসেম আলীটা যেমন মরা বাগান আগলে পড়ে আছে, তিনিও তেমনি ওই শূন্য অট্টালিকাকে আগলে পড়ে আছেন।'

'তোমার মতন বুড়ো?'

'আমার থেকেও দিদিমণি! তা 'রাজা'টাজা তো আর নেই এখন দেশে? বিটিশ চলে গেল, সব রোশনাই ফুরিয়ে গেল। গোটা দেশটা ভিকিরি হয়ে গেল। সরকার বড় বড় রাজা মহারাজাদের হকের ধন কেড়েকুড়ে নিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিল। এই আমাদের রাজাবাবুর কত জমিদারী ছিল রংপুরে, দিনাজপুরে, গাইবাঁধায়, সে

সব উপে গেল।···কে জানে কী হল এতে? গরীবের কিছু লাভ হল? গরীব তো দিন দিন আরো গরীব হচ্ছে!'

শিপ্রা ওর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দেখে।

অনেকটা দূরে থেকে নন্দন রুমাল নেড়ে শিপ্রাকে ডাক দেয়, আর স্বদেশ দুই হাতের তালু উল্টে এমন একটা ভঙ্গী করে যা ভাষায় এনে দাঁড় করালে হয়, 'হোপলেস!'

শিপ্রা কিন্তু চঞ্চল হয় না, ওদের দিকে তাকিয়ে কাসেমের অলক্ষ্যে একটা ভেংচি কাটে। যার অর্থ হয়, 'আমি এখন নড়ছি না।'

কাসেমেরও টাকা পেয়ে কথা পেয়ে গেছে। তার সঙ্গে আবার রিকশাওলাও যোগ দেয়, বলে, 'গেরস্ত লোকেরাও ক্রমশঃ 'গরীব' হয়ে যাচ্ছে, আর ভুঁড়িদারদের ভুঁড়ি বাড়ছে!'

কাসেমের গোঁফ-দাড়ি ভেদ করে একটু তিক্ত হাসি বেরিয়ে আসে। আবার নুয়ে পড়ে বলে, 'রোহিণী, কথাটা বলেছিস ভাল। দেশে জমিদারের বদলে হয়েছে ভুঁড়িদার! কী অবস্থা ফিরল তাতে দেশের? রাজা-জমিদাররা যেমন প্রজা ঠ্যাঙাতেন, তেমনি আবার প্রজাপালনও করতেন। এই আমাদের রাজাবাবুর বাবাই তো দেশে কত কী করে গেছলেন। ওই যে মেয়ে ইস্কুল দেখলেন, হাসপাতাল দেখলেন, চ্যারিটির ডিসপেনসারি দেখলেন···কীরে রোহিণী, দেখিয়েছিস তো সব?···সব তেনার করা। আর আমাদের এখনকার রাজাবাবু? যখন যৌবন ছিল, ছেলেদের কলেজ করে দেছেন, লাইব্রেরী ঘর করে দেছেন, আকাল পড়লে দেশের গরীবদের জন্যে ছত্তর খুলে দেছেন, ভুঁড়িদাররা করবে এ-সব? ওরা শুধু ঠ্যাঙাতেই জানে।

এই সব 'সাধারণ' লোকেদের মুখের সস্তা রাজনীতি শোনাটা কিছু নতুন নয়, শিপ্রারা অনেক ঘোরে, তবু একটা ঘাস-কাটা মালির মুখে এসব কথা ওর কাছে অপ্রত্যাশিত লাগল। তাই অগ্রাহ্যভরে

কথান্তরে না গিয়ে বলল, 'ঠ্যাঙানো-ট্যাঙানো আসছে কোথা থেকে বাপু? এখন কেউ তো কারুর প্রজা নয় যে ঠ্যাঙাবে।'

কাসেম আলী একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'গরীব চিরকালই বড়মানুষের প্রজা দিদিমণি! হাতে না মেরে ভাতে তো মারছে।'

'তুমি তো চিরকাল বাগান নিয়ে থেকেছ, এত কথা জানলে কী করে?'

কাসেম আলী এখন একটু মধুর হাসি হাসে! বলে, 'কথা কি আর বই-খাতা নিয়ে শিখতে হয় দিদিমণি? জগতের হালচাল হাওয়া-বাতাস এরাই শিখিয়ে দিয়ে যায় কথা। কতকাল এসেছি এই পিথিবীতে—কত দেখছি শুনছি! আর এখনই শুকনো ঘাস নিয়ে পড়ে আছি, আগে কত মানুষজন আসত, কত কথা কইত, শুনতে শুনতেই বুদ্ধি জেগেছে।'

নন্দন, স্বদেশ, আর রাজর্ষি একটা উল্টে পড়ে থাকা ভাঙা বোটের ওপর বসে সিগারেট টানতে টানতে বলে, 'বুড়ো শিপ্রার আরো মোটা কিছু না খসিয়ে ছাড়বে না।'

স্বদেশ আবার বলে, 'এখান থেকে নড়া হবে না, চোখ রাখতে হবে। বলা যায় না, রিকশাওলাটার ওই বুড়োর সঙ্গে যোগসাজস আছে কিনা, ভেতরে ভেতর আঁতাত আছে মনে হচ্ছে, শিপ্রার গলায় সোনার হার রয়েছে না?'

'শিপ্রা তো বলে সোনার নয়।'

'তাহলেও ঘড়ি রয়েছে।'

'আমরা তিন-তিনজন রয়েছি, আর ওই দুটো বুড়ো অমনি—', রাজর্ষি তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'শিপ্রা ঠিকই বলেছে স্বদেশ, তুই একটা কাওয়ার্ড।'

'ভালই তো, আমরা দুজনে কাওয়ার্ড হলে তো তোরই লাইন ক্লীয়ার!' হীরো হবার খোলা চান্স পেয়ে যাবি।'

রুমাল নাড়িয়ে নাড়িয়ে সঙ্কেত করে।

তবু শিপ্রা নড়ে না। শিপ্রার কৌতূহল প্রবল।

এ যেন গল্প-উপন্যাসের কাহিনীর মত। বিরাট এক ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের মধ্যে বৃদ্ধ রাজা বাস করেন একা, পুরনো কালটা হাত থেকে খসে যাচ্ছে, তবু ভেসে যাবার সময় তৃণখণ্ড ধরে রাখার মত তিনি নিজের কালটা আঁকড়ে ধরে আছেন। কেমন দেখতে কে জানে! রাজার মত? না, বাজে বুড়োর মত? কৌতূহল প্রবল। শিপ্রা তাই আবার প্রশ্ন করে, 'ওই রাজাবাবু ছাড়া আর কে আছে?'

'আর কেউ না দিদিমণি, রাজাবাবু কেবল বান্দা নফর নিয়ে থাকেন।'

'রাণীমা নেই?'

কাসেম একটু থেমে বলে, 'রাণীমা? তিনি কোথায়? তিনি তো কুমারবাবু কলকাতায় চলে যাবার পরই মারা গেলেন।'

'ওঃ! সেকালে লোকে এইসব করত। ছেলে শহরে গেল তো ছেলেকে ত্যাগ, নিজে সুইসাইড, কত কী! যাকগে, ও তুমি বুঝবে না। তা তোমার এই রাজাবাবুর নাম কী?'

বুড়ো আবার কুঁজো পিঠ খাড়া করে বলে, 'রাজা নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরী!'

ভঞ্জচৌধুরী!

ভঞ্জচৌধুরী!

শিপ্রা যেন একটু থমকায়। এই অদ্ভুত ধরনের পদবীটা কোথায় যেন শুনেছে শিপ্রা। কোন একদিন।

ঝাপসা গলায় বলল, 'আচ্ছা, তোমায় অনেক কষ্ট দিলাম, এই নাও।'

আবার দিল, একটা দুটাকার নোট।

বুড়ো কাসেম আলী নোটটা নিয়েই সেলাম জানিয়ে চলে গেল

পাশের দিকে তার নিজের আস্তানায়। লাল টালীছাওয়া মালির ঘরটাও আগে বাগানের মধ্যে একটা সৌন্দর্য স্বরূপ ছিল। সামনে লতানে গাছ, সেই লতার শাখা-প্রশাখা যেন ঘরখানাকে বেষ্টন করে থাকত।···বাপ শওকত আলী, মা-মরা এই ছেলেটাকে নিয়ে এখানে এসে পড়েছিল, বাপছেলে দুজনে থাকত কুটিরখানায়। আস্তাবলের সহিসরা রান্নাবাড়া করত, সেখানেই এদের বাপ ছেলের ভাতের বরাদ্দ ছিল।

বাপ মরল, ছেলের আর বিয়ে-সাদী করে সংসার পাতা হল না। হেড সহিসের মেয়ে টুনির সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই আসনাই ছিল অথচ টুনির বিয়ে হয়ে গেল অন্য জায়গায়। কাসেম নামের যে জোয়ান একটা ছেলে তার ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করে, তা তাকিয়েও দেখল না টুনির বাপ। তখন মটর গাড়ি কেনা হয়েছে, ঘোড়া আর ঘোড়ার সহিস শুধু রাজবাড়ির শোভা স্বরূপ বিরাজ করছে।

কালক্রমে ঘোড়াও মরল, সহিসও গেল। পরিত্যক্ত ঘরটায় বাস করতে এল ধোবি বুলাকি। মাইনে করা ধোবি, রাজবাড়ির ছাড়া আর কারুর কাপড় কাচে না।···তা বুলাকিলালের বিধবা বৌটার সঙ্গেই দীর্ঘকাল ঘর করেছে কাসেম, কিন্তু বৈধ করে নিয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে নয়। বৈধ করে নেওয়ার বাধাও তো পাহাড়প্রমাণ।

বুলাকিরা হিন্দু।

সে বুড়িও মরেছে অনেক দিন হয়ে গেল।

এখন আর মালির ঘরের সেই চেহারা নেই, টালী খতম হওয়ায় করোগেট টিন দিয়ে চাল ছাওয়া হয়েছে, লতানে গাছেরা আর তাকে বাহুবেষ্টনে বেঁধে বসন্তের বাতাসে তিরতির করে কাঁপে না, ফুর-ফুরিয়ে দোলে না। কাসেমকে এখন রাজবাড়ির থেকে চাকরে ভাত দিয়ে যায়, বুড়ো খায় দায় আর নেশা করে।

নগদ টাকা পেলেই তাই তার চোখটা চকচক করে ওঠে।

সে যাক—

এদিকে বেড়াতে আসা মেয়ে শিপ্রার চোখটা চকচক করে উঠল কেন ?

শিপ্রা এখন এত দ্রুতপায়ে ওর বন্ধুদের কাছে পৌঁছে গেল কেন ?

নন্দন সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে বলল, 'আর কত টাকা খসাল বুড়ো ?'

'বুড়ো আবার কী খসাবে ? আমিই ইচ্ছে করে দিলাম তো। এতক্ষণ বকবক করল। সে যাক, এই শোন, আমাদের মনুজ, মানে মনুজরা, মানে মনুজের পদবী কি রে ?'

'কেন হঠাৎ ? চৌধুরী তো ?'

'শুধু চৌধুরী ?'

'না, ওই চৌধুরীর আগে কী একটা ছিল, মনুজ বলে, সেটাকে বাহুল্যবস্তুর মত ত্যাগ করেছে।'

'সেই আগেরটা কী, সেটাই জানতে চাওয়া হচ্ছে তেরোস্পর্শ !'

তিনজনকে মাঝে মাঝে শিপ্রা তেরোস্পর্শ বলে।

রাজর্ষি বলল, 'ভঙ্গ না ভঞ্জ কী যেন ! নামটাও তো লম্বা ছিল। সবই ছেঁটেছে।'

শিপ্রা আত্মস্থভাবে বলে, 'জানি। মনেও পড়েছে, তবু একবার ভেরিফাই করে নিলাম।···মনুজেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরী !···আমার বিশ্বাস এই বাগান প্রাসাদ এসব ওদের।'

'ওদের ? মানে মনুজদের ?'

হেসে ওঠে ওরা, 'হঠাৎ এ আবিষ্কার ? বুড়ো কী কী গুল মেরেছে ?'

'বুড়ো আবার কী গুল মারবে ? তবে ওর কাছে জানলাম ওই প্রাসাদ মধ্যে বাস করেন এক চক্রহারা বৃদ্ধ সর্প, নাম নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরী।'

'তার থেকে কী প্রমাণ হল ?'

'প্রমাণ নয়, অনুমান। তোরা শুনিস নি, নর্থের দিকে মনুজদের কোথায় যেন সম্পত্তি-টম্পত্তি আছে, শুধু ওর ঠাকুরদা বুড়ো অমর অবিনশ্বর হয়ে টিকে আছে বলে সে সব ওদের হাতে আসছে না। ওর দাদারা না কি বলে, ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করলে বুড়োর মরার নামে হরির লুঠ দিতাম।'

'তা থেকেই প্রমাণ হল ? মানে অনুমান করলে তুমি, মনুজ এই ভঞ্জচৌধুরীরই বংশোদ্ভুত ?'

'ভুলটা কোথায় হল ? নামের গড়নে মিল, পদবীতে মিল, তাছাড়া এই দিকেই ওদের সব আছে টাছে, তাহলে অবিশ্বাসের কী আছে ?'

'তা বেশ না হয় বিশ্বাসই করলাম। কিন্তু তাতে হলটা কী ?' নন্দন বলল, 'মনুজটা সঙ্গে থাকলে না হয় বলা যেত, চল, তোদের বাড়িতে ঠেলে গিয়ে উঠি, উঠে একটু রাজকীয় চা খাওয়া যাক।'

* * *

শীতের দুপুরের ঝোড়ো ঝোড়ো বাতাসে শিপ্রার চুল উড়ছে, আঁচল পড়ে যাচ্ছে, শিপ্রাকে বড় ভাল দেখাচ্ছে।

শিপ্রা তার সেই ভাল-লাগানো মুখে একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'মনুজ সঙ্গে নেই বলেই ব্যাপারটা ঘটানো যায় না কেন ? ঢুকে পড়লেই হয়।'

'শিপ্রা, বুড়ো বুঝি তোর মাথার মধ্যে ক্ষুধিত পাষাণ ঢুকিয়ে দিয়েছে ? তাই ঢুকে পড়ে দেখে নেবার ইচ্ছে হয়েছে ? বাজে কথা রাখ, চল আর কোথায় কি দেখবি। কিছু রেয়ার গাছ আছে। টিনের চাকতিতে তার নাম-ধাম বংশ পরিচয় লিখে গায়ে ঝুলিয়ে রাখা আছে, এই পর্যন্ত।'

নন্দন যোগ দেয়, 'ওইগুলো দেখবি তো দেখে আয়। সেই শিব-মন্দিরটাও দেখলাম, জাত যাওয়া শিবঠাকুর !'

'আমি কিন্তু সহজেই ঢুকে পড়তে পারি।'

'ঢুকে পড়ে কী হবে?'

'বাঃ! দেখব। রাজবাড়ি তো দেখে লোকে।'

'এই বিপুল ভারতবর্ষের কত কত জায়গায় রাজবাড়ি আছে, সবই কি তুমি দেখতে চাও বৎস?'

শিপ্রা আবার মুখটা ভেঙিয়ে বলে, 'সব না দেখলাম, মনুজেরটা দেখব।'

'নো ফল দিদিমণি,' রাজর্ষি হেসে বলে, 'তাতেও কিছু হবে না। মনুজ তোমায় এই রাজবাড়িতে খইকড়ি ছড়িয়ে নিয়ে আসবে না।'

শিপ্রা চোখে আগুন জ্বেলে বলে, 'খইকড়ি ছড়িয়ে মানে?'

'ওই তো 'কনে, নিয়ে আসার সময় যা করে।'

'তুমি একটি বুদ্ধু।' শিপ্রা কড়া গলায় বলে, 'কিছু জানিস না শুনিস না, ইয়ার্কি মারতে আসিসনে। খইকড়ি ছড়িয়ে লোকে কনে নিয়ে আসে, না মড়া নিয়ে যায়? দেখিস নি রাস্তায়?'

'ওঃ সরি! কিন্তু বিয়েতেও কী একটা ছড়ায়! আমি দেখেছি।'

'না দেখনি! দেখলে আর এরকম বোকার মত কথা বলতে না। বিয়েতে যেটা ছড়ায়, সেটা হচ্ছে ধান।'

'ব্যস ব্যস, ওতেই হবে। ও একই কথা। কি রে রাজ, ঠিক বলি নি?···সেই যে ছেলেবেলায় কী একটা পড়েছিলাম—তিল হইতে তৈল হয়, দুধ হইতে দৈ, আর ধানেতে তৈয়ার হয়, মুড়ি চিড়ে খৈ। তবে? ও একই হল।'

'তোমার মাথা হল, আর মুণ্ডু হল।'

শিপ্রা কড়াগলায় বলে, 'তোদের কারুর সাহস না থাকে আমি একাই গিয়ে দেখে আসব।'

'বুড়োকে টাকাকড়ি খাইয়ে পটিয়েছিস বুঝি? নিয়ে যাবে ভেতরে?'

শিপ্রা মুখে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গী করে বলে, 'খাওয়ানো টাওয়ানো কাপুরুষদের কাজ। আমি ওসবের মধ্যে নেই। স্ট্রেট যাব, বলব, আমি রাজবাড়িটা দেখতে চাই।'

'দেখে শেষ অবধি কী হবে?'

'আবিষ্কার!' শিপ্রা অবলীলায় বলে 'মনুজকে গিয়ে বলতে পারব তোর ঘরবাড়ি দেখে এলাম।'

'তাতেই বা কী হল?'

স্বদেশের এই প্রশ্নে শিপ্রা জিভ বার করে বলে, 'এতেই বা কী হচ্ছে? এই টাকা-পয়সা খরচ করে কষ্ট করে, নর্থবেঙ্গল দেখে বেড়ানোয়? লোকে দার্জিলিংয়েই যায়, এই সব বাজে বাজে জায়গায় আসে?'

'ওটাই নতুনত্ব।'

'তবে আমারটাও নতুনত্ব।'

বলে বটে শিপ্রা কোমর বেঁধে ঝগড়া করার ভঙ্গীতে, কিন্তু কাজে পরিণত করতে পারে না।

প্রাসাদের দেউড়ি বাগান থেকে বেরিয়ে অনেকটা ঘুরে। বাগানটাই সবটা ঘুরে দেখা সহজ কাজ নয়। তারপর আবার—।

তাছাড়া রিকশাওলা রোহিণী মাথা নেড়ে বলল, 'গিয়ে ফল হবে না দিদিমণি, ভিজিটার্সরা ঢুকতে পায় না। বুড়ো রাজার কড়া হুকুম। দেউড়ি পর্যন্ত যাবেন চলুন, রিকশ ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

শিপ্রা হঠাৎ যেন রিকশওলাটার উপর রেগে গিয়েই বলে, 'থাক্ তোমায় আর দয়া দেখাতে হবে না।'

এক-একটা রিকশায় দুজন দুজন চড়ে আবার তরতরিয়ে এগিয়ে চলল। প্রাসাদের একটা পাশের দিক দেখা যাচ্ছে, নন্দন সেই দিকে তাকিয়ে বলে, 'ধ্বংস কি আর সাধে হয়? অর্থের কী অপব্যয়! এতবড় একটা বাড়ি, সত্যিই এর মানে হয়?'

শিপ্রা উদাস গলায় বলে, 'মানে কি আর সব সময় বোঝা যায়? হয়ত এতবড় বাড়ি না হলে, নিজেদেরকে ধরাতে পারত না তারা! হয়ত আমাদের প্রয়োজনের হিসেব তাদের 'প্রয়োজনের' নাগাল পাচ্ছে না!'

তোমায় ক্ষুধিত পাষাণেই ধরেছে', নন্দন বলে, 'ওই প্রাসাদে ঢুকলে আর রক্ষা থাকত না, তোমায় ফিরিয়ে আনা যেত না।'

শিপ্রা অবশ্য অত কিছু আচ্ছন্ন হয় নি। ও শুধু ভাবছিল, ওই প্রাসাদে ঢুকে কোথায় কী আছে না আছে দেখে গিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া যেত মনুজকে।···তবে আচ্ছন্ন যদি করে থাকে শিপ্রাকে, সে হচ্ছে এই চিন্তাটা—এখনও তো কত সম্পত্তি মনুজদের, যাকে কি বলে মরাহাতী লাখ টাকা, তবু অমন অভাবির মত থাকে কেন মনুজ?

ওদের দলে সবাইয়ের থেকে মিতব্যয়ী মনুজ, যার জন্যে সবাই ওকে 'কিপটে' বলে। এই তো শিপ্রাদের এই ভ্রমণ দলের সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার জন্যে কত অনুরোধ করেছে এরা, বিশেষ করে শিপ্রা, মান সম্মানের মাথা খেয়ে একথাও বলে ফেলেছিল, 'দূর, তুমি আমার বেড়ানোটাই আলুনি করে দিচ্ছ—'

মনুজ হেসে বলেছিল, 'লবণ সমুদ্র সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তবু আলুনি?'

'সেটাই তো কথা। লবণ সমুদ্র! যার উপর ভাসতে ভাসতেও তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরে যেতে পারে মানুষ।'

মনুজ ওর দিকে ওর সেই সর্বদা কৌতুকহাস্যের ছাপমারা চোখ দুটো মেলে একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখে বলেছিল, 'অবস্থাটা ছাতি ফাটার মত কিনা সেটা এখনো স্থির হয়নি।'

'থাক যথেষ্ট হয়েছে! যেতে হবে না তোমাকে! কে যেতে সাধছে?'

'তুমিই সাধছ।'

'ঘাট হয়েছে।'

'আরে বাবা, আমি তো গোড়াতেই বলে দিয়েছি, বেড়িয়ে বেড়াবার মত পয়সাকড়ি নেই।'

'কেনই বা নেই তা জানি না। অত বড় একটা বাড়িতে থাকো, ভাড়া নয়, নিজেদেরই।'

'পূর্বপুরুষের বড় বাড়ি উত্তরপুরুষের কোন কাজে লাগে না শিপ্রা, যদি তাকে ভেঙে খাবার উপায় না থাকে।'

শিপ্রা রাগ করে বলেছিল, 'তা ভেঙে খেলেই তো হয়! কী লাভ অত বড় বাড়িতে?'

'জানি না কী লাভ! আমায় একটু থাকতে দেয় তাই থাকি। তবে কখনও কখনও কানে আসে, ভেঙে খেতে নাকি আইনগত কিছু বাধা আছে। সেই যে একটি 'ফসিল' অলক্ষ্যে বসে আছেন, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কিছু হবে না। আর তিনি অনুমতি দেবেন না।'

'তা নীচতলাটা তো ভাড়াও দেওয়া যায়? নাকি তাতেও আইনগত বাধা?'

মনুজ হেসে উঠে বলেছিল, 'না, তা হয়ত নয়, দেখতেই বা আসছে কে? কিন্তু তাতে আবার চিন্তাগত বাধা। আমার পূজনীয়া জননী আর পূজ্যপাদ দুই দাদা ভেবে দেখেছেন, ভাড়া বসালে সে আর ইহজীবনে নড়বে না এবং না নড়লে ভেঙে খাবার, মানে বিক্রী করার, বহুৎ অসুবিধে ঘটবে।'

'আশ্চর্য! তোমাদের ওই বাড়ির সামনে যে লনটা আছে তাকে মেনটেন করতে তো তোমরা কিছুই কর না, শুধু শুকনো ঘাস—ওটা বেচে দিলেও তো অন্য কোনখানে একটা ছোট বাড়ি করে ফেলা যায়। যা দাম জমির!'

'এসব আলোচনা বাড়িতে অনেক শুনি শিপ্রা! তোমার মুখে আর শুনতে চাই না।'

শুনে শিপ্রার মুখটা নিভে গিয়েছিল, গলার কাছটা যেন বসে

গিয়েছিল, শিপ্রা মুখটা ফিরিয়ে বলেছিল, 'তা বটে, তোমাদের নিজস্ব ব্যাপারে আমার কথা বলার মানে হয় না। বলি তোমাকে একটু সুখী স্বচ্ছন্দ দেখতে চাই বলেই—'

মনুজ ওর ফেরানো মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'আমাকে কি তুমি অসুখী দেখো? কখনও অস্বচ্ছন্দ?

দেখে একথা বলতে পারে নি শিপ্রা।

মনুজ সর্বদাই হাসিখুশি, সর্বদাই স্ফূর্তিবাজ। নিতান্ত অভাবের কথাও ও হাসতে হাসতেই বলে।

মাঝে মাঝে হয়ত এরাও বলে—স্বদেশ, নন্দন, রাজর্ষি! কিন্তু তবুও তাদের বলার মধ্যে যেন কিছু লজ্জার ছাপ আছে। মনুজ বেপরোয়া।···মনুজ চায়ের দোকানে উঠলে কখনো দাম দেয় না। প্রত্যেকের 'পালা' আছে, মনুজের পালা নেই। শিপ্রা সেটা ম্যানেজ করে।

শিপ্রা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, হাতখরচ পায় ভাল, ওর দাদার গাড়ি ওকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে যায়। অথচ শিপ্রার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না দাদা-বৌদি।

অতএব শিপ্রা তিনটে সহপাঠির সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে পড়তে পারে, আর একটা ছেলের সঙ্গে এক রিকশয় বসে টো টো করে বেড়াতে পারে।

এখন ওর সঙ্গে রাজর্ষি।

বোধ করি শিপ্রার মন রাখতেই সে বলে, 'ওরা যে একেবারে উড়িয়ে দিল, একবার চেষ্টা করে দেখলেও হত।'

শিপ্রা ভুরু কুঁচকে বলে, 'কিসের?'

'ওই রাজবাড়ি দেখার।'

'থাক্ তোকে আর এখন ইয়ে দেখাতে হবে না, তখন তো চুপ মেরে থাকলি। রাজবাড়ি টাজবাড়ি দেখতে দেয়, আমি জানি।'

'অবশ্য এখন আর দেখবার মত কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

বলল রাজর্ষি।

শিপ্রা বলল, সেটাও একটা দেখবার। ওই ধ্বংস হয়ে যাওয়া দৃশ্যের মধ্যে অনেক ইতিহাসের ছাপ থাকে। তাদের রুচির, কুরুচির, শিক্ষার, সংস্কৃতির, অমিতাচারের, অপরিণামদর্শিতার।'

এই রিকশওলাটা এদের কাছে নামহীন, তাছাড়া এর কাছে স্মৃতির ঐতিহ্য নেই কিছু, বয়েস কম, বেশী দিন আসে নি এদেশে। তাই নীরবে গাড়ি চালিয়ে চলেছিল।

নন্দন আর স্বদেশ পড়েছিল বুড়ো রোহিণীর পাল্লায়, সারাক্ষণ বকবকিয়ে চলেছে সে, আর পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় নন্দন গলা নামিয়ে বলল, 'রাজুটা সমানে যেভাবে হীরো হবার তাল করছে, মতলব ভাল নয় মনে হচ্ছে। মনুজটার না কপাল ফাঁসে।'

'ধ্যেৎ, শিপ্রা ওরকম মেয়ে নয়।'

'কি রকম মেয়ে, টেষ্ট করে দেখতে গিয়েছিলি নাকি মাইরি?'

'এই স্বদেশ, অসভ্যতা করিস নি। ও রকম ফ্রী মেয়েকে কে টেষ্ট করতে যাবে বাবা? দেখিস না আমাদের সঙ্গে কীভাবে ঘুরছে। ও যে 'মেয়ে', একথা মনে আনতেই দেয় না।'

রিকশাওলা বলল, 'ঠাকুরবাড়ি যাবেন তো?'

রাজর্ষি বলে উঠল, 'থাক্ বাবা আর ঠাকুরবাড়ি-টাড়িতে দরকার নেই। পেটে একটু চা পড়ার দরকার।'

শিপ্রা দৃঢ়ভাবে বলে, 'বাঃ দেখতে যখন বেরিয়েছি সবই দেখব। ঠাকুর-ই বা কী দোষ করল?···কী ঠাকুর রিকশাওলা?'

'কালী আছেন, রাধাকৃষ্ণ আছেন।'

'ঠিক আছে, তুমি চল।'

এদের রিকশাই আগে আগে যাচ্ছে অতএব এরা যেদিকে যাবে,

ওদেরও সেই দিকেই যেতে হবে। শিপ্রা তাই রিকশাওলাকে আদেশ দেয়, 'চল ঠাকুরবাড়িতেই।'

মন্দির চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে নন্দন বলে ওঠে, 'আচ্ছা ভারতবর্ষে এমন কোন দেশ আছে, যেখানে কালীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নেই?'

শিপ্রা বলল, 'দক্ষিণ ভারতে একটু কম।'

'কম হলেও নেই এমন নয়। কারণ কী?'

'কারণ বহুবিধ নন্দন, ও নিয়ে আর মাথা ঘামাতে বসিস নি, পেট এখন চা চা ডাক ছাড়ছে।'

শিপ্রা অবশ্য ভক্তিভরে ঠাকুর প্রণাম করতে বসে নি, তবে প্রণামীটা দিয়েছিল, এবং সেই অবকাশে ঠাকুরের ইতিহাস জেনে নিচ্ছিল। এসে স্বদেশের কথাটা শুনতে পেয়ে রেগে রেগে বলল, 'এই স্বদেশটাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক। যখন তখন 'চা চা' ডাক ছাড়ছে।'

'ঠিক আছে, আর চা ডাক ছাড়ব না। নিজে নেমে পড়ে তেষ্টা মিটিয়ে নেব। আর কারুর যখন দরকার নেই।'

'তোমার মতন স্বার্থপরের উপযুক্তই কথা।'

বলে শিপ্রা রিকশায় চড়ে বসে বলে, 'চল বাবা কোথায় কি চায়ের দোকান আছে, আগে চল সেখানে।'

স্বদেশ মৃদু স্বরে বলে, 'ওই রাজবাড়ি দেখতে যাওয়া হল না বলে ক্ষেপে গেছে।'

'আরে বাবা রিকশাওলা তো বলল, দেখার কিছু নেই।'

'তাতে কী! ইচ্ছা পূরণে বাধা পড়াটাই কারণ!'

ওরা এখন চায়ের দোকানে ঢুকবে, চা খাবে, আড্ডা দেবে, পরদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করবে। বাসে বাসে ঘুরছে ওরা, ট্রেনের টিকিটের ঝামেলা এড়িয়ে।···এখন আবার চলে যাওয়া যায় উল্টো মুখে? যেখানটাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে সেইখানে?

সকলেই একবার করে বলেছে রাজবাড়িতে এখন আর দেখবার কিছু নেই, কিন্তু রাজা নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জ চৌধুরী নামের মানুষটাই কি দেখবার নয়? দ্রষ্টব্য নয় ওঁর ওই বিরাশী বছরের জীবনের জীবনযাত্রা প্রণালী?

ওরা যখন চায়ের দোকানে, নিখিলেন্দ্র তখন দক্ষিণের বারান্দায়। ঋতুতে ঋতুতে উনি টাইম কিছু চেঞ্জ করেন, গ্রীষ্মকালে এ সময় বসেন পূবের বারান্দায়, কিন্তু এখন শীতকাল তাই এখনো দক্ষিণের বারান্দায় রোদের আমেজে বসেছেন। সময়টা বিকেল, তাই বৈকালিক প্রসাধনে সজ্জিত।

নিখিলেন্দ্রর শীতকালীন বৈকালীন সাজটা অভিনব। পরণে সূক্ষ্ম সুন্দর চওড়া পাড়ের খাঁটি কাশ্মীরী শালে বানানো ঢোলা পায়জামা, আর গায়ে তেমনি শালের কাপড়ে বানানো গলাবন্ধ লং কোট। তার হাতে আর ঝুলে চওড়া কাজ, গলার সরু উঁচু কলারে সূক্ষ্ম সরু কাজ, বোতাম ঘরের দু' পাশেও সেই কাজেরই জের নেমে এসেছে! পাঞ্জাবীর বোতাম সেটটি ডালিমদানা রঙের চুনী বসানো সোনার, সব ক'টি আবার একটি সরু সোনার চেনে একসূত্রে গ্রথিত।...

নিখিলেন্দ্রর সর্বদা ব্যবহারের ঘড়ি বলতে এখনও 'ঘড়ি ঘড়ির চেন'। তার চেনটি এখনকার কন্যাদায়গ্রস্ত কোন পিতার কন্যাদায় লাঘব করে দিতে পারে। ভাঙলে এ যুগের হাল্কা ফন্‌ফনে খান তিনেক গহনা হয়ে যায়।

নিখিলেন্দ্রর পায়ে জরির কাজ করা সবুজ মখমলের চটি, আর হাতের কাছে মিনের কাজ করা ছোট্ট ছ' কোণা মোরাদাবাদী টেবিলের উপর একটি কাশ্মীরী কাজের গরম কাপড়ের টুপী রক্ষিত। টুপীটা মাথায় দেন এমন নয়, তবে সেটটা থাকেই সম্পূর্ণ।

নিখিলেন্দ্রর দু' হাতের আট আঙুলে আটটি আংটি, শাদা কালো নীল সবুজ আর জমাট রক্তলালের বিচিত্র সমারোহ।

নিখিলেন্দ্র যে আরামকেদারায় বসে আছেন, তার হাতা দুটো এত চওড়া যে একটা ছোট ছেলেকে অনায়াসে তোষালে বিছিয়ে শুইয়ে দেওয়া যায়। আগে ওর একটা হাতায় নিখিলেন্দ্রর পোষা কুকুর 'সূর্য' বসতো। শীতকালে সূর্যের গায়েও গরম কাপড়ের জামা থাকত। দর্জির তৈরি। নিখিলেন্দ্রর নির্দেশে দর্জি এসে গায়ের মাপ নিয়ে গিয়ে বানিয়ে দিত। বোতামের ফুটোয় ফুটোয় বসিয়ে দিত রূপোর ছোট ছোট ঘণ্টা। তার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজত ঝুনঝুনিয়ে। সূর্য ভারী দামী আর মানী কুকুর ছিল, মরে গেল বয়েস হয়ে।

আর কুকুর পোষেন নি, বলেছেন, 'সূর্যর জায়গায় আর একটা কুকুর দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।'

নিখিলেন্দ্রর আংটি পরা আঙুলগুলি এখনও কোমল মসৃণ, চাপার মত রং, লম্বা ছাঁদের গড়ন।

নিখিলেন্দ্রর চটি পরা পা দুটি কোমল এবং রাজকীয় সুষমামণ্ডিত, পায়ের নীচে কার্পেটের উপর আলাদা ছোট্ট গোল একটু কার্পেট পাতা।

নিখিলেন্দ্রর দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথার চুল এখনও ঘন বিন্যস্ত, এবং কালো চকচকে।

বৈষ্ণবদের যেমন নিয়মের তিলকসেবা, নিখিলেন্দ্রর তেমনি নিয়মিত কলপ-সেবা। খাশ চাকর ব্রজেনের ওটি নিত্যকর্ম। নিখিলেন্দ্র আরামকেদারায় বসে থাকেন আলবোলার নল মুখে দিয়ে, আর ব্রজেন পিছনে দাঁড়িয়ে নিখুঁত নিষ্ঠায় প্রতিটি রূপোলি চুলের গায়ে কালির ছাপ মারে।

সে কাজটা হয়ে গেছে একটু আগে।

ব্রজেন একবার একখানা হাতআয়না বাড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'এদিক থেকে ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না রাজাসাহেব, একবার দেখবেন?'

নিখিলেন্দ্র বিরক্ত হাতে ঠেলে দিয়েছেন সেটা। বলেছেন, 'মেজাজ খারাপ করে দিসনে ব্রজেন, পিছন থেকে না পারিস, পাশে এসে ঠাহর কর।'

নিজেকে দেখেন নিখিলেন্দ্র লম্বা দেওয়াল-আয়নায়। চওড়া ঘেরা বারান্দার প্রতিটি প্রান্তের দেওয়ালে দেড় মানুষ সমান উঁচু উঁচু ইটালিয়ান আয়না আঁটা আছে। পায়চারি করতে করতে এক একটার সামনে দাঁড়ান। শুধু বাগানের দিকটায় নয়, ওদিকের বারান্দায় ফাট ধরেছে, রেলিঙের নীচের কার্ণিশ ঝুলে পড়েছে।

নিখিলেন্দ্রর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ এখনো সোজা সতেজ, রং এখনো দুধে এবং গোলাপের সংমিশ্রণ। গায়ের চামড়া টান টান। নিখিলেন্দ্র এখনো নিয়মিত ব্যায়াম করেন, এবং নিয়ম করে প্রতিদিন আস্ত একটা করে মুরগীর ঝোল খান।

এখন 'বৈকালী ভোগে' নিখিলেন্দ্র নিয়ে বসেছেন ফলের থালা।

ধারিতে কাজ করা বড় রূপোর ডিশে আঙুর আপেল কমলা খেজুর কলা আর কিছু বাদাম পেস্তা কিসমিস। ছোট একটি রুপোর চামচ করে অল্প অল্প মুখে দিচ্ছেন, আর হাতের বইটা পড়ছেন।

খাওয়া দেখে বোঝা যাচ্ছে না নিজস্ব দাঁত, না বাঁধানো দাঁত, আর চশমাহীন চোখে পড়া দেখে বোঝা যায় না লোকটার চোখের বয়েস বিরাশী তিরাশী!

গ্রীষ্মকালের সাজটা নিখিলেন্দ্রর রাজকীয় হলেও স্বাভাবিক ঘেঁষা।

তখন আলমারি থেকে নামে চওড়া মুগার চুড়ি দেওয়া কালো ইঞ্চি-পাড় চুনট করা কাঁচির ধুতি, লক্ষ্ণৌ চিকনের কাজ করা গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, সিল্কের গেঞ্জি, আর হরিণের চামড়ার চটি।··· তখন সন্ধ্যাবেলায় যুঁই ফুলের মালা থাকে গলায়, আর সকালে কাছের ছোট ত্রিপদীতে রুপোর রেকাবে বেলফুল ভাসে জলে।

তখন বৈকালিতে শীতল পানীয়, শীতলকারী ফল, কানের পিঠে আতর মাখানো তুলো।

তখন বারান্দার খিলেনে খিলেনে খশখশের পর্দা ঝোলে, তাতে গোলাপজল মিশোনো জল ছিটোনো হয়। অনেক আগে শুধু গোলাপজল ছিটোনো হত, সেটা এখন বদলেছে।

বদলাতে অবশ্য হয়েইছে কিছু কিছু, তবু সমস্তটা পরিবেশ মিলিয়ে আরামকেদারায় আসীন এই নিখিলেন্দ্রকে থিয়েটারের সাজা নবাবের মত দেখতে লাগছে।

ফল খাওয়ার পর নিখিলেন্দ্র বই রাখলেন, পা দুটোকে টান টান করে ছড়িয়ে দিলেন।

মুহূর্তে পিছনে বসা ব্রজেন সামনে এসে খাওয়া পাত্রটা তুলে নিয়ে চলে যায়, সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটা ঘণ্টা বাজায়।

একটা দাসী সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে, বাসনটা নিয়ে নেয়, ব্রজেন প্রায় কর্তার গলায় বলে, 'যশো, সুখেন চা বানাচ্ছে? না ঘুম মারছে?'

দাসী যশোদা টানা সুরে বলে, 'শোন কথা! ঘুম মারবে? ঘড়ি নেই তার হাতের গোড়ায়?'

'ঘড়ি থেকেও তো হরঘড়ি বকুনি খাচ্ছে।'

ব্রজেন কর্তার কাছে চলে আসে।

নিখিলেন্দ্র বললেন, 'পোস্ট অফিসে একবার খবর নিয়ে দেখতে হবে ব্রজেন, বইগুলোর কী হল।'

'যেগুলো বিলেত থেকে আসার কথা ছিল?'

'বুঝেছ তাহলে? ব্রজেন তাহলে বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে।... আশ্চর্য, কতদিন আগে খবর পেয়েছি তারা পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ব্রজেন খাশ চাকর, পেয়ারের চাকর, তাই তার সাহস কিঞ্চিৎ বেশী। সে বলে ওঠে, 'আচ্ছা রাজাসাহেব—মানে যদি দোষ না নেন তো বলি—'

'আঃ ব্রজেন, কতদিন বলেছি, তোর ওই ভনিতা করাটা ছাড়। যা বলবি চট করে বলবি।'

ব্রজেন মাথা চুলকে বলে, 'আজ্ঞে, সাহস হয় না।'

নিখিলেন্দ্র ধমক দিয়ে বলে ওঠেন, 'ব্রজেন, তোর ন্যাকামী রাখবি? আড়ালে তো সর্বক্ষণ আমার নামে ছড়া বাঁধছিস।

ব্রজেন জিভ কাটে, কান মলে, বলে, 'এ কী বলছেন রাজাসাহেব?'

নিখিলেন্দ্র মুচকি হেসে বলেন, 'যা বলছি ঠিকই বলছি। অবশ্য তোর দোষ নেই, তুই মনুষ্য-ধর্ম পালন করছিস মাত্র।...যাক, কী যেন বলছিলি?'

'বলছিলাম আজ্ঞে, লাইব্রেরী ঘরে তো বইয়ের সীমা পরিসীমা নেই, তবে আবার বিলেত আমেরিকা থেকে বই আনানো কেন?'

ব্রজেনের কথার সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেন্দ্রনাথের চোখের সামনে সেই ঘরটা ভেসে ওঠে।...দেয়াল জোড়া উঁচু উঁচু আলমারি, চামড়া-বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা সব বই সাজানো।... সবই প্রায় ইংরিজি। ঠিক একালের কোনো কিছুই নয়, সবই নিখিলেন্দ্রর বাবার আমলের। নিখিলেন্দ্রর সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বর্তমানে নিখিলেন্দ্র একটি বিলেতি কোম্পানীতে নোবেল প্রাইজ পাওয়া দুটি বইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন, ওরা খবর দিয়েছে পাঠিয়েছে, কিন্তু আসছে না।

কে জানে পোষ্ট অফিসই মেরে দিয়েছে কিনা, দুর্নীতি তো সমাজের শিরায় উপশিরায়। নিখিলেন্দ্র বাড়ির বাইরে পা দেন না, তবু দেশের সব খবরই যে কেমন করে রাখেন!

ব্রজেনের প্রশ্নে নিখিলেন্দ্র টেবিলে টোকা দিতে দিতে বলেন, 'তুই তো জীবনভোর অনেক ভাত খেয়েছিস, তবু আবার ভাত খাস কেন?'

ব্রজেন প্রায় অবিশ্বাসের সুরে বলে, 'অত বই সব আপনার পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে ?'

'হবে না ? বইগুলো কী আজকের ? জ্ঞান হয়ে অবধিই তো দেখছি। বাবার কেনা।'

'সব পড়ে ফেলেছেন ?'

ব্রজেনের চোখে তথাপি বিস্ময়।

নিখিলেন্দ্র একটু গভীর হাসি হেসে বলেন, 'তা পড়ে ফেলেছি। কিন্তু তোকে বলে ফেলে যে ভাবনা হচ্ছে রে!'

'ভাবনা ?' আজ্ঞে, ভাবনা কেন ?'

'তা' তুই হয়ত ভেবে নিবি 'পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে যখন, তখন ওগুলোয় আর কী কাজ! বিক্রমপুরে চালান দিয়ে দিই।'

ব্রজেন অবোধ গলায় বলে, 'আজ্ঞে, বিক্রমপুরে কেন ? সেখানে কে আছে ?'

নিখিলেন্দ্র আর একবার ধমক দিয়ে ওঠেন, 'খোকামী ছাড়বি ব্রজেন ? বিক্রমপুরের মানে জান না তুমি হারামজাদা বদমাস!'

ব্রজেন আর কথা বলে না, ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে রেলিংয়ের ধারে গিয়ে।

নিখিলেন্দ্রর মুখে ফুটে ওঠে একটু কৌতুক হাসি। পাশের টিপয় থেকে পড়া খবরের কাগজটাই আবার তুলে নেন।

হাতের কাছে সব মজুত থাকা চাই। যখন যা দরকার পেতে চান।

একটু পরেই সুখেন এল চা নিয়ে।

চকচকে পালিশ নিকেলের ট্রে, তার উপর একজনের মত টী-পটে চা, সঙ্গে সোনালি বর্ডার কাপ-প্লেট, চিনি আর দুধের আলাদা আলাদা পট। সব কিছুর উপর হাতে বোনা লেশের ট্রে-ঢাকা ঢাকা দেওয়া। আগে ওই চিনিটা ছিল সৌখিন, যা নিয়ে বলা যেত,

'আপনার চায়ে ক'টা চিনি দেব?' এখন আর সেরকমটি নেই। এখন এমনিই চিনি।

আহার্য পানীয় এসব কোথা থেকে আসে, সে খোঁজ নিখিলেন্দ্র রাখেন না—সংগ্রহের ভার ব্রজেনের উপর, ব্রজেনের ভাগ্নে সুখেনের উপর, হয়ত কিছুটা মদনবাবুর উপর। মদন ঘোষ, নিখিলেন্দ্রর ম্যানেজার, বাজার সরকার, নায়েব, গোমস্তা, লাইব্রেরিয়ান, কেয়ার-টেকার, একাধারে সব।

নিখিলেন্দ্রনাথ কী থেকে কী হচ্ছে তার হিসেব রাখতে পারেন না, মাঝে মাঝে যখন মদন কাগজপত্র নিয়ে আসে সই করাতে, হিসেব দাখিল করতে, বিরক্তচিত্তে সইটা করেন, হিসেবটা ঠেলে দেন।···বলেন, কতকগুলো মিথ্যে হিসেবের বোঝা দেখে কী ফায়দা হবে আমার মদন?···যতদিন ঠিকমত খেতে পাব, হিসেব দেখতে চাইব না। যদি খাওয়ায় টান পড়ে, তখন হিসেবের খাতা চাইব। ···আর হয়ত তখন—' হা-হা করে হেসে উঠে বলেন, 'তখন খাতা দেখার পর হয়ত তোমাদের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেতে চাইব।··· তবে মাথাটা নেহাৎ কাঁচা নয়, কী বল মদন?'

মদন গম্ভীর ভাবে বলে, 'বেশ তো, অতই যখন সন্দেহ, আমায় ছুটি করে দিন।'

নিখিলেন্দ্র আরো হাসেন ঘর ফাটিয়ে, 'আহাহা, যতই হোক তোমরা পুরনো লোক, একটু চক্ষুলজ্জা, মায়ামমতা আছে, বুড়োকে দুটো খেতে দিয়ে নিজেরা খাচ্ছ-দাচ্ছ, নতুন কেউ এলে হয়ত প্রথমেই নিজের চোখের চামড়াটাই খেয়ে বসবে।'···

সবাইয়ের সঙ্গেই এই রকম কথা নিখিলেন্দ্রর। সুখেন যখন ঘর ঝাড়তে আসে, বলেন, 'রাজা রাজড়ার বাড়িতে কাজ করার একটা মস্ত অসুবিধে, কী বলিস সুখেন? যে-সে বড়মানুষের মত পকেটে পয়সা ঝনঝনায় না, সেই পকেটসুদ্ধ জামা ঘরের আলনায় ঝোলে না।'

সুখেনও অবোধ হয়।

অবাক হয়ে বলে, 'তাতে কী?'

নিখিলেন্দ্র সেই ওঁর হা হা হাসিটা হাসেন, বলেন, 'ব্যাটা স্রেফ মাতুলক্রম! তবে রাজা ব্যাটারাই আসলে ভিখিরি বুঝলি? পয়সা যে কি তা চোখেও দেখে না, হাতেও ছোঁয় না। কিছু ইচ্ছে হলে ম্যানেজারের কাছে হাত পাতে!'...

সুখেনও নতবদনে বলে, 'আহা সে তো নিজেরই টাকা।'

'পাগল!' নিখিলেন্দ্র বলেন, 'রাজা জমিদারদের আবার নিজের টাকা কী রে? স্রেফ পরের টাকা কেড়েকুড়ে চেয়েচিন্তে জড় করে রাজাই চালমারা!'

আবার হাসেন, বলেন, 'জ্ঞানের কথা বলছি বলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে বসিসনি, ব্যবহারটা কিন্তু অজ্ঞানের মতই চালিয়ে যাব।'

সুখেন কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না, আড়ালে বলে 'পাগলা বুড়ো।'

একমাত্র যশোদার সঙ্গেই নিখিলেন্দ্র শান্তভাবে কথা বলেন, কতকটা যেন সমীহর সুরেও। বলেন, 'মা যশোদা!'

যশোদাও বলে 'বাবা', কদাচ রাজাসাহেব বলে না।

এরা কেউই নতুন নয়, বিশ-পঁচিশ ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে আছে ওরা এ সংসারে। নতুন শুধু সুখেন, ওর বয়েসই এখনো কুড়ির ওপারে পৌঁছয়নি। মামা দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল নিজের সাহায্যার্থে। সুখেন তখন বালক মাত্র।

প্রথম এসে মামার শিক্ষামত নিখিলেন্দ্রর পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেই দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, 'উঃ কী বাড়ি বটে রে বাবা! ও মামা, যদি হারিয়ে যাই?'

ব্রজেন বকে বলেছিল, 'হারিয়ে যাবি কী আবার?'

নিখিলেন্দ্রনাথ গম্ভীর হাসি হেসে বলেছিলেন,—'ভুল নয় রে ব্রজেন,

বালক হচ্ছে নারায়ণ, ঠিকটা চট করে বুঝে যায়। ঠিক বলেছিস খোকা, হারিয়ে যাবার ভয় আছে। এ বাড়ির সবাই হারিয়ে যায়। সাবধানে থাকিস বাপু!···তা এটিকে কোথা থেকে আমদানী করলি রে ব্রজেন? তোর তো ছেলেমেয়ে নেই? ভাইপো বুঝি?'

'আজ্ঞে না, ভাগ্নে।'

'তা হঠাৎ ওই বাচ্চাটাকে মার কাছ থেকে নিয়ে এলি যে?'

ব্রজেন অবলীলায় উত্তর দিয়েছিল, 'মার কাছে তো পেটে কীল দিয়ে ভাঙা ঘরে পড়ে থাকা, এখানে দুটো খেয়ে-পরে বাঁচবে, ভাল ঘরে থাকবে।'

'ঠিক আছে, মনে থাকে যেন। এক্ষুনি থেকে যদি মামাগিরি ফলিয়ে খাটাতে বসবি ওকে, তো দুটোকেই দেউড়ি পার করে দেব।'

'খাটাব? ওকে? ওই শিশুটাকে?'

ব্রজেন আকাশ থেকে পড়ে কান মলেছিল, জিভ বার করেছিল।···

অবশ্য তার বেশী আর কিছু করেনি,—ভাগ্নেকে নিজের খিদমদগার করে নিয়েছিল তখন থেকেই।

প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন একদিন নিখিলেন্দ্রনাথের তৈল মর্দন সভায়। দৈনিক আধপোয়া খাঁটি সরষের তেল গায়ে ঘষে ঘষে উপিয়ে ফেলার নিয়ম নিখিলেন্দ্রর, কাজটা ব্রজেনেরই ছিল।

কিন্তু নিখিলেন্দ্রনাথ একদিন জানলেন সুখেন নামের সেই বালকটা নাকি কিছু কিছু কাজ করবার জন্যে নাছোড়বান্দা। তার নাকি শুধু শুধু বসে বসে খেতে লজ্জা লাগে। সে তেল মাখাবে।

নিখিলেন্দ্র বলেছেন,—'ষোলো আনা থেকে আঠারো আনা বাদ দিয়ে ধরছি তোর কথা ব্রজেন, তবু দেখি কচি হাতটা কেমন লাগে।'

তা দেখা গেল—হাতটা কচি হলেও ছেলেটা মজবুত খুব। আর কাজের ভঙ্গীটা ভাল। তদবধি সুখেনই তেল মাখায়। ভারী ঝরঝরে লাগে।

অথচ এই নিখিলেন্দ্র একদা ভাবতে পারতেন না তাঁর বাবা জগদীন্দ্রনাথ গায়ে অত তেল মাখেন কী করে!

তখন নিখিলেন্দ্র ঘোরতর সাহেব। পোশাক পরেন নিখুঁৎ ইংরেজি চালে, খান বাবুর্চির হাতে ইংলিশ ডিশ, ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে নিজেদের বনভূমিতে শিকার করতে যান, এবং 'হুকুম করা' ব্যতীত চাকর-বাকরদের সঙ্গে যে অন্য কোন কথা বলা যায়, তা জানেন না।

জগদীন্দ্র যখন নিজস্ব বারান্দায় একটা পাথরের চৌকীতে চোখ বুজে বসে তৈল-সুখ উপভোগ করতে করতে তাঁর খাশ চাকর বৃন্দাবনের সঙ্গে দেশের দশের সমাজ-সংসারের কথা কইতেন, নিখিলেন্দ্রর চোখে পড়ে গেলে নিখিলেন্দ্র মরমে মরে যেতেন।

মেমসাহেব গভর্নেস রেখে স্ত্রীকে ইংরেজি শেখাবার সাধ ছিল নিখিলেন্দ্রর প্রবল, কর্তা রাজারও তাতে অমত ছিল না। ছেলে সাবালক হয়ে গেলে, আর তার জীবনের জানলায় উঁকি দিতে যাওয়ার প্রশ্ন ছিল না এই সব বড়ঘরে। ছেলে ইয়ার বন্ধু নিয়ে মদ খাচ্ছে শুনলে অভিভাবকরা বড়জোর ভুরু কোঁচকাতেন, আর বাগানবাড়িতে বাঈজী এসেছে শুনতে পেলে একটু নিঃশ্বাস ফেলতেন। বেশী হলে বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করতেন স্বামীকে আয়ত্তে রাখতে পারছে না বলে।

এর বেশী নয়।

এর বেশী বলবার সাহসই বা কোথায়?

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না? নিজের যৌবন ইতিহাস বন্ধ ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে আসবে না?

নিজের স্ত্রীকেই ঘষেমেজে মনের উপযুক্ত করে নেবার ইচ্ছে তো শুভ ইচ্ছে। জগদীন্দ্র সেই ইচ্ছেকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বয়ং স্ত্রীই বেঁকে বসলেন।

কারণ কী ?

কিছু না, ম্লেচ্ছচাল ধরবেন না এইটাই ইচ্ছে। অনেক সাধ্য-সাধনা করেছিলেন নিখিলেন্দ্র, ফল হয়নি। মহালক্ষ্মী মাপ চেয়েছেন, স্বামীর মনোবৃত্তি অনুসারিণী হতে পারছেন না বলে অনুতাপ করেছেন, কিন্তু নিজের মনোবৃত্তি থেকে নট নড়ন-চড়ন।

শেষ চেষ্টায় নিখিলেন্দ্র বললেন, 'তা'হলে—আমি যদি অন্য দিকে মন দিতে যাই আমাকে দুষো না।'

মহালক্ষ্মী হেসে বলেছিলেন, 'দুষবো কোন সাহসে ? আমি ইংরিজি শিখে মেমসাহেবী চাল শিখলেই তুমি আর কোন দিকে মন দেবে না, এমন অন্যায় আশা মনে পুষে আছি নাকি ?'

নিখিলেন্দ্র আহত গলায় বললেন, 'আমাকে তোমার সেইরকম মনে হয় ? বেচাল দেখেছ কোনদিন ?'

'দেখিনি ঠিকই, তবে তোমাদের বংশে যেটা 'বেচাল' বলে গণ্য নয়, সেটা নিয়ে মাথাও ঘামাই না।···তাছাড়া যতই চেষ্টা কর, তোমার সাহেব বন্ধুদের বৌদের মত কি করে তুলতে পারবে আমাকে ?···যারা নিজের দেশ-ঘর সমাজ সংসার ছেড়ে শুধু বরের হাতটি ধরে এই দূরদূরান্তরে চলে এসেছে, তাদের সঙ্গে এখানের মেয়ে পাল্লা দেবে কি করে ? তার সমাজ আছে, সংসার আছে, কুলদেবতা, গৃহদেবতা আছে। ব্রত নিয়ম পাল-পার্বণ আছে।'

'থাক্ থাক্ তোমার যে কত আছে তা আর শুনতে চাই না। যাক এতই যখন আছে, তখন একটা সামান্য লোক থাকল আর না থাকল !'

মহালক্ষ্মী মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'ভগবানের দেওয়া জিনিস, না থাকায় এমন সাধ্য কার ?'

মহালক্ষ্মী ছিলেন গেরস্ত ঘরের মেয়ে, কেবলমাত্র রূপের জোরে এই রাজবাড়ীতে এসে পড়েছিলেন। কার সূত্রে কে কোথায় দেখে

খবর দিয়েছিল, জগদীন্দ্র মোহিত হয়ে বলেছিলেন, 'এ মেয়ে আমার ঘরে ছাড়া আর কোথায় যাবে ?'

মহালক্ষ্মীর চালচলন, কথাবার্তা, কিছুই এই ভঞ্জচৌধুরীদের বাড়ীর মত নয়, নিখিলেন্দ্র জ্ঞানাবধি যাদের দেখে এসেছেন তাঁদের থেকে সবই আলাদা।···নিখিলেন্দ্রর মা অবশ্য ওই আলাদাকে ভেঙে ক্ষইয়ে ছাঁচে ফেলবার চেষ্টা করেছেন গোড়া থেকেই, কিন্তু এই 'স্বতন্ত্র' ভঙ্গীটুকুই নিখিলেন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছে বেশী। নিখিলেন্দ্র বুঝেছেন 'ওর মধ্যে বস্তু আছে'।

আর সেইজন্যেই চেষ্টা ছিল খনির হীরেকে ছিলে কেটে অধিক ঔজ্জ্বল্য দেবেন।···মহালক্ষ্মী তাঁর সে সাধে বাদ সেধেছিলেন। অনেক জেরার পর মহালক্ষ্মী তাঁর অনিচ্ছের কারণ ব্যক্ত করেছিলেন, যেখানে সামান্য একটু স্পর্শদোষে পাথরের ঠাকুরের জাত যায়, সেখানে মেমসাহেব স্পর্শিত রক্তমাংসের মেয়েমানুষটার জাতটা কোথায় তোলা থাকবে ?

থাকবে না, যাবেই।

আর সেই জাত যাওয়া অবস্থা নিয়ে মহালক্ষ্মীকে না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে থাকতে হবে চিরদিন। মেমসাহেবের কাছে পড়ার পর মহালক্ষ্মীকে এখনকার মত সমাদরে দুর্গা পূজোর ঘরে ডাকা হবে ? রাধানাথের সেবার অধিকার বজায় রাখা হবে ?···নিখিলেন্দ্রর মা কি সানন্দ চিত্তে পুত্রবধূর হাত থেকে শরবৎ নিতে হাত বাড়াবেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরটা দিন নিখিলেন্দ্র, তারপর বিবেচনা।

উত্তর দিয়ে উঠতে পারেন নি নিখিলেন্দ্র।

অতএব স্ত্রীকে বিদূষী করে তোলা সম্ভব হয় নি তাঁর। কিন্তু তাতে কি অসুখী ছিলেন নিখিলেন্দ্র ? বরং নিখিলেন্দ্রর টগবগে জীবনখানা যেন একটা নিশ্চিত ছায়ার সম্বলে বড় শান্তি আর নিশ্চিন্ততা বোধ করেছে।

মহালক্ষ্মী কখনও স্বামীর অবাধ্যতা করতেন না। শুধু কোনে কাজে অনিচ্ছে হলে বলতেন, 'যদি হুকুম কর তো করব বৈকি।'

'হুকুম? আর যদি হুকুমটা না করি?'

'তাহলে বাঁচব।'

নিখিলেন্দ্র রাগ করতে পারতেন না, সেই অনবদ্য সুন্দর মুখে দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে বলতেন, 'তাহলে আর হুকুম করা হ না। না বাঁচলে ঠিক এরকম আর একখানা মুখ জোগাড় করা শক্ত হবে।'

কিন্তু এসব কথা কোন যুগের? কোথায় সেই মহালক্ষ্মী? সেই নিখিলেন্দ্রই বা কোথায়?

তা সেই প্রেমে বিহ্বল, অথচ খোলা তলোয়ারের মত লোকট আর না থাকলেও, এখনো 'আছে' সে। নিজের কেন্দ্রে স্থির অটল

এখনও সে প্রেমে নিমগ্ন, শুধু সেই প্রেমপাত্রটি নিজে নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরীরই প্রেমে পড়ে আছেন তিনি।

তেল মাখার অভ্যাস, ব্যায়ামের অভ্যাস, সবই সেই প্রেম থে উদ্ভূত।

চা খাওয়ার পর চাকর-বাকরদের বিদায় করে দিয়ে একটা লেখ নিয়ে বসেন নিখিলেন্দ্র। এই ভঞ্জচৌধুরী বংশের ইতিহাস লিখছে তিনি। এটা তাঁর এক রকম শখ। এর জন্যে জোগাড়যন্তরও করে হয়েছে বিস্তর। পুরনো কাগজপত্র দলিলটলিল ঘাঁটতে হয়েছে অনেক তবে গোড়াপত্তনটা জগদীন্দ্রর হাতে ঘটেছে। হঠাৎ বাবার তৈরি একটি বংশতালিকা দেখে উৎসাহ জাগে নিখিলেন্দ্রর।···তিনি শু বংশতালিকাই নয়, বংশের পূর্বতনদের পরিচয়লিপিও লিখছেন যদিও তার ভূমিকাটি বড় মজার।

শুরু করেছেন সেই ভূমিকা এই দিয়ে—'উত্তরবঙ্গের ভঞ্জচৌধুরীর দীর্ঘকাল ধরে ধরে মানে প্রতাপে সৎকাজে, অসৎকাজে মমতায়

নির্মমতায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। যত দূর জানা যায় এ বংশের আদিপুরুষ ভীমনাথ পূর্ববঙ্গ থেকে এই উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করেন, এবং নিজ শক্তিতে এক বিশিষ্ট ভূম্যাধিকারীতে উন্নীত হন, ভীমনাথের পুত্র ইত্যাদি।

সে ভূমিকা সারা হয়েছে এইভাবে, 'কিন্তু কেন সেই বংশের একাদশ পুরুষ নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরীর এই বৃথা পরিশ্রম ?···কে এর মর্যাদা বুঝবে ? কে একে মূল্য দেবে ?···এই ভঞ্জচৌধুরীদের বংশের কীর্তিকলাপের ইতিহাস জেনে কে পুলকিত হবে ? এই বংশ যে কেবলমাত্র প্রজাশোষক অত্যাচারী জমিদারই নয়, প্রজাপোষক দয়ালু জমিদারও, একথা জেনে কে গৌরব বোধ করবে ?···আর এই ধনে মানে জ্ঞানে বিদ্যায় সমৃদ্ধ বংশের ধারা বজায় রাখবার দায়িত্ব অনুভব করবে কে ? কারা ?···জানি না। তবু লিখে রাখছি, মনে হচ্ছে এটি আমার একটি পবিত্র কর্তব্য, আমার পূর্বপুরুষদের তর্পণ। তিল জল দিয়ে গতানুগতিক শ্রাদ্ধ তর্পণে আমি বিশ্বাসী নই, অথচ মনে হয় বংশের পূর্বতনদের উদ্দেশ্যে কিছু করার থাকে।···অনুভব করছি এঁদের অমিতাচার নিন্দনীয়, কিন্তু সেই অমিতাচার থেকেই তো দেশে শিল্পকলার উন্নতি হয়, শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার হয়, 'বহুজন হিতায়' কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

ভঞ্জচৌধুরী এবং ভঞ্জচৌধুরীদের মত অনেক বংশই আজ কবরে শায়িত, আইনের শাসনে তো বটেই, অনাচারের ফলেও। এঁদের মধ্যে ভালও ছিল যেমন অনেক, মন্দও ছিল তেমনি প্রচুর।···এঁরা নিহত হয়েছেন। কিন্তু আজকের সমাজ ?···সেখানে মন্দের প্রাচুর্য অকল্পনীয়, ভালটা অনুপস্থিত।

কিন্তু এসব আলোচনা করি কার সঙ্গে ?

ব্রজেন, সুখেন, মদনের সঙ্গে ? মালি কাসেম আলীর সঙ্গে ? তাই এই লেখা।

অবশ্যই বৃথা পরিশ্রম। তবু করছি সে পরিশ্রম। কেন? জানি না।'

এই ভূমিকা দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে লিখে চলেছেন এক এক-জনের পরিচয়লিপি। নিখিলেন্দ্রর পিতামহ যে সিংহ শিকার করে এ অঞ্চলে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন এবং পিতা বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন, এ সব কথা গুছিয়ে লেখবার জন্যে মালমশলা মজুত। তাড়াহুড়ো করেন না; ওই দিনের আলোটা ফুরিয়ে আসার মত, জীবনের গোনা দিনের আলোও ফুরিয়ে এল বলে, এ যেন তাঁর খেয়াল নেই। দৈনিক দু ঘণ্টার পাঁচ মিনিট কমও নয়, বেশীও নয়। ঘড়ি ঝোলানো আছে সামনের দেওয়ালে, তার মধ্যবর্তী একটি পাখি আধ ঘণ্টা অন্তর মিষ্টস্বরে ডেকে উঠে সময়ের সংকেত জানিয়ে যায়।···ঘড়িটা একবার খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ওর জন্মস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে সারিয়ে এনে-ছিলেন, তাতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।

কিন্তু তখনও সামর্থ্য ছিল, তখনও বড় গোলার তলা।

ঠিক দু ঘণ্টা পরে হাত থেকে কলম নামান। চারটে থেকে ছটা। শীতকালে এর মাঝখানে আলো জ্বেলে দিয়ে যেতে হয়! হুঁশিয়ার ব্রজেনের একদিনও ব্যতিক্রম হয় না। পুরনো ঝাড়লণ্ঠনের গেলাশে গেলাশে ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা আছে, জ্বালালেই রোশনাই, তবে যেদিন লোড শেডিং হয়, সেদিন মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়।··· 'ব্যতিক্রম' শব্দটা নেই।

আজ লাইট আছে।

ব্রজেন যথাসময়ে জ্বেলে দিয়েছে। হঠাৎ লেখা থামাতে হল নিখিলেন্দ্রকে। 'ব্যতিক্রম' শব্দটা টেবিলে নেমে এল। কলম নামিয়ে রাখতে হল অসময়ে।

ব্যতিক্রমের নমুনা হয়ে দেখা দিল মদন ঘোষ। এনেছে এক আর্জি।···

বললেন, 'কি ব্যাপার মদন ?'

মদন জোড়হস্তে অনেক ভণিতা করে বলল, তার সাক্ষিপ্ত অর্থ এই ···দেউড়িতে তিনটে যুবক ছেলে, আর একটা যুবতী মেয়ে রাজবাড়ি দেখবার বায়না করছে। বাড়ী যদি দেখা নাও হয়—রাজাসাহেবের সঙ্গে দেখা না করে ছাড়বে না।'

তার মানে প্রার্থী।

আগে তো হরদমই এরকম হত, বহুবিধ আর্জি নিয়ে আগমন ছিল তাদের, জগদীন্দ্রর মৃত্যুর পর নিখিলেন্দ্র সেও ম্যাও সামলেছেন দীর্ঘ দিন একতলার বৈঠকখানা বাড়ীতে বসে।

কিন্তু সে পাট চুকেওছে তো অনেক দিন। দাতব্যের খাতে যদি কিছু ব্যয় হয় তো, সে মদন ঘোষের বিবেচনায়।···দৈবাৎ সে হিসেব দেখাতে এলে নিখিলেন্দ্র হাত নেড়ে ভাগিয়ে দেন, বলেন, 'মারা হচ্ছে তো মশা মদন, তার রক্ত আর আমার হাতে লাগাতে আসছ কেন ?'

কিন্তু আজ আর মদনের এলাকা নয়, তারা রাজবাড়ী দেখবে, রাজা দেখবে।

নিখিলেন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন, 'কি রকম ছেলেমেয়ে ? দেহাতি ?'

'আজ্ঞে না না, খাশ কলকাতার বলেই বোধ হল।'

'কোন পার্টি-ফার্টির নয় তো ? এক বুর্জোয়া বুড়ো একা কত সম্পত্তি ভোগ করছে তাই খোঁজ নিতে এসেছে ?'

'কি করে জানব হুজুর ? বলেছি দেখাটেখা হবে না, তক্ক করছে। ছেলেগুলো তত নয়, মেয়েটাই বেশী।'

নিখিলেন্দ্র কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে বলেন, 'তাই নাকি ? তা তর্কের বায়নাটা কি ?'

'বলছে, সব জায়গাতেই তো পুরনো রাজবাড়ীটাড়ী দেখতে দেয়।'

'হুঁ। তা একথা বললে না তুমি, মালিকরা কবরে কি শ্মশানে গেলে দেয়, বেঁচে থাকতে দেখতে 'পাশ' লাগে।'

'সব বলেছি হুজুর! ছেলেগুলো তো চলে যায় যায়, কিন্তু ওই মেয়েটাই—আপনার কাজের ব্যাঘাত করতে হল, কসুর মাপ করবেন।'

'ভণিতা রাখ মদন। তুমি না হয় ওই মেয়েটাকেই নিয়ে এস।'

মদন একটু ইতস্তত করে বলে, তাই বলিগে তবে। কিন্তু শুধু মেয়েটাকে আমার সঙ্গে ছাড়তে রাজী হবে কি?'

নিখিলেন্দ্র হঠাৎ একটা বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়ে গিয়ে ব্যতিক্রমে বিরক্তি বোধ করেন না। (এখনকার) স্বভাবগত কৌতুক হাস্যে বলেন, 'রাজী হবে না বলছ? তা বেশ সব কটাকেই নিয়ে এস। রাজার অন্দরে তো পর্দানসীন বলতে শুধু মা যশোদা।'

হঠাৎ কী যেন একটা মনে পড়ায় বলেন পশ্চিমের ভেতর কোঠার দরজা যেমন বন্ধ থাকে আছে তো?'

'আজ্ঞে আছে, দেখে এসেছি।'

'তবে যাও।'

মদন চলে যায়। খুব বেজার মুখেই যায়। ভেবেছিল কর্তা 'দূর দূর' করে উঠবেন, সেই সংবাদটা ফলাও করে দিতে পারবে। তা নয় 'নিয়ে এস'। নির্ঘাৎ কোন ব্যাপারে মোটা টাকা চাঁদা নিতে এসেছে।

দেউড়ির বাইরে তখন রীতিমত রাগারাগি চলছে। চা খাওয়ার পর শিপ্রা যখন আবার বলে বসল, 'এই ছেলেগুলোর কাপুরুষতার জন্যেই আমার একটা কৌতূহল মিটল না, তখন হঠাৎ রেগে গিয়েই ওরা বলছে, 'ঠিক আছে, চল তোমার কৌতূহল মিটিয়ে দিইগে।'

আর দেউড়ীর বাইরে যখন মদন ঘোষ ভাগাবার তাল করছে, তখন ওরা বলেছে, 'কী শিপ্রা, কৌতূহল মিটেছে? না এখনো আছে?'

'আছে, থাকবে।'

বলে শিপ্রা মদন ঘোষকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরভাবে বলে—'আপনাদের রাজাসাহেব কাগজ-টাগজ পড়েন? খবরের কাগজ?'

মদন কড়া গলায় বলেছে, 'পড়েন না মানে? ওই নিয়েই তো আছেন।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে সবচেয়ে বিখ্যাত বিখ্যাত কাগজে এই কাহিনী নিয়ে চিঠি ছাপব। নিশ্চয় চোখে পড়বে তাঁর।'

'এই কাহিনী নিয়ে—'

মদন ঘোষ চোখ ঠিকরে বলে, 'এই কাহিনী মানে?'

'এই যে আপনি কিছুতেই বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে দেন না তাঁকে, বৃদ্ধকে নিজের কবলে পুরে রেখেছেন। এটা একটা বনেদী বংশ, সবাই আগ্রহ করে পড়বে।'

মদন ঘোষ তীব্র দৃষ্টি হেনে বলেছে, 'ওঃ আমি রাখব তাঁকে কবলে পুরে?···তবে যান নিজের চক্ষেই দেখে আসুন মালটিকে। এই—বলতে যাচ্ছি। তবে নিষেধ করলে আমার করার কিছু নেই।'

সেই মদন ঘোষকেই আসতে হল ডেকে নিয়ে যেতে।

মদন ঘোষের এই শীতের সন্ধ্যাতেও গরম লাগে।

এ বাড়ির চারদিকে চারটে সিঁড়ি আছে, তবে সদর থেকে 'হল-এর' সামনের সিঁড়িটাই বেশী অভিজাত।

নীচু নীচু ধাপের টানা লম্বা লম্বা সিঁড়িটা আর তার পালিশ উঠে যাওয়া চওড়া কাঠের রেলিংটা পুরণো ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

'এই হল্'এ আগে কত গান বাজনার আসর বসেছে।' শুকনো শকুনির মত চেহারার মদন ঘোষ নিজের ঐতিহ্যের পরিচয় দিতেই বোধহয় অত বেজার মুখেও কথাটা বলে। আগের কালের সাক্ষী সে হেলাফেলার লোক নয়।

ছেলে তিনটি তো কথা বলবেই না, এমনিতেই শিপ্রার জেদে

আর কথা কাটাকাটিতে গুম হয়েছিল প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে যেন আরো গুম হয়ে গেল। গা ছমছম করছিল নাকি?

লন্ থেকে অনেকগুলো মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা সে বারান্দা চারদিক থেকে ঘিরে আছে এই বৃহৎ ইমারতটাকে। সামনের বারান্দা থেকে বিরাট হল্। হল থেকে দোতলার ওঠার সিঁড়ি। বিবর্ণ কার্পেট পাতা ওই হলটা যেন উনবিংশ শতাব্দীর এক টুকুরো নমুনা ধরে বসে আছে।

দেওয়াল ঘেঁষে যত সব আসবাবপত্র সব কালচে হয়ে যাওয়া মেহগিনি কাঠের। যদিও এই বৃহৎ হল-এর তুলনায় সাজসজ্জা সামান্যই। কে যেন মাঝখান থেকে কোথায় সরিয়ে দিয়েছে।

এই শূন্যতাবাহী অতীতের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়লে গা ছমছম করাই স্বাভাবিক।

কিন্তু শিপ্রাও এমন চুপচাপ হয়ে গেল কেন? এতক্ষণ তো তার মুখে খৈ ফুটছিল। ওর জেদেই বন্ধুরা অকারণ এতটা সময় বাজে খরচ করতে বাধ্য হয়, এই লজ্জা ঢাকতেই হয়ত অত প্রগলভতা করছিল।

এখন কিন্তু চুপ।

মদন ঘোষের পিছু পিছু উঠছে যেন পা গুনে গুনে।

কিন্তু ওরা কি ভেবেছিল এরকম একটা নাটকীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হবে তাদের?

কাশ্মীরী কাজের ওই পোশাক পরা আর মাথায় তেমনি এক টুপি চাপানো ওই লোকটা কি বাঙালী? এই লোক মনুজের ঠাকুর্দা? ওই কালো চকচকে চুল, ওই দীর্ঘ সতেজ দেহ আর কৌতুকরঞ্জিত তাজা মুখ, কি কারো ঠাকুর্দার মুখ?

শিপ্রা যেন মরমে মরে যায়।

এরপর কী করে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাবে সে? সমানেই যে

সে তর্ক করে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে এই মনুজদের বাড়ি, এবং 'সেই বুড়োই' ওর ঠাকুর্দা।

এ লোক কোন ভাষায় কথা কয়ে উঠবে কে জানে? অবশ্যই অবাংলা।

বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষে টানা লম্বা সোফা পাতা, তার আস্তরণ জীর্ণ বিবর্ণ, দেহটা খানদানি।

আস্তে নমস্কার করল চারজনেই আর ওদের চমকে দিয়ে এবং আশ্বস্ত করে সেই নবাবি চেহারার ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কোথা থেকে আসছ তোমরা?

স্বদেশই হাল ধরল, 'কলকাতা থেকে।'

'ও আচ্ছা! মেয়েটি? তোমাদের বোন?'

স্বদেশই উত্তর দিল. 'না, আমরা একসঙ্গে পড়ি।'

'ও আচ্ছা! কোন কলেজে?'

'এবার নন্দন মুখ খুলল, 'ইউনিভার্সিটিতে।'

একা স্বদেশই বা সব ক্রেডিটটা নেবে কেন?

'তা' হঠাৎ রাজবাড়ি দেখার শখ হল কেন?'

এবার শিপ্রার কথা বলার দায়, কারণ ছেলে তিনটে ওর মুখের দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

শিপ্রাকে বলতেই হল 'কোনখানে বেড়াতে গেলে, রাজবাড়ি-টাজবাড়িতো দেখা হয়।'

কথায় তেমন ধার ফুটল না।

নিখিলেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্কের মত বললেন, 'তা' বটে। কিন্তু এটা কি দেখার সময়? দিনের বেলায় এলে—'

শিপ্রা ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠে, 'তাই তো আসছিলাম। সেই দুপুরবেলা যখন আপনাদের বাগান দেখতে এসেছিলাম এরা আসতে দিল না। বললে, ঢুকতে দেবে না, বকবে, মারবে।'

'বকবে, মারবে ?'

হঠাৎ ওদের চমকিত করে হা হা শব্দে হেসে উঠলেন নিখিলেন্দ্র, হাসির দাপটে তাড়াতাড়ি মাথায় বসিয়ে দেওয়া টুপিটা নড়ে খসে পড়পড় হল।

আর ঠিক তখন মনে হল শিপ্রার, এ মুখ যেন সে কোথায় দেখেছে। এই মুখ, এই হাসি!

টুপিটা নামিয়ে হাতেই রেখে নিখিলেন্দ্র হাসি থামিয়ে বললেন, তা বলতে পারে। মানুষকে বিশ্বাস করবার পথ তো মানুষ রাখে না, পরস্পরকে ভয় আর সন্দেহ করাই আমাদের পেশা।.....

স্বদেশ চটপট বলে ওঠে 'ভয়টা একেবারে অমূলকও নয় বকুনিটা ইনি যথেষ্ট দিয়েছেন,' বলে মদনের দিকে তাকাল।

নিখিলেন্দ্রও তাকালেন, বললেন, 'কী হে মদনবাবু, ডিউটি পালন করছিলে? কর, বেশ কর, তবে একটু বুদ্ধি খরচ করতে হয়।'

বলেই এদের আবার আচমকা চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, 'তা' ওরই বা দোষ কী? আমিই তো ভাবছি—কোনো পার্টির ছেলেমেয়ে কিনা, এই বুর্জোয়া বুড়োটা একা একখানা প্রাসাদ দখল করে ভোগ করছে কোন অধিকারে এই দেখতে এসেছে কিনা।'

এই সময় অলক্ষ্য হাতের সুইচ ঝাড়ের লাইটগুলো জ্বলে ওঠে, সমস্ত পরিবেশটা জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে। আর সেই আলোয় দেখা যায় শিপ্রার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

শিপ্রা সেই লাল লাল মুখে বলে, অথচ আপনিই এইমাত্র বললেন, আমরা কেউ কাকে বিশ্বাস করতে পারি না।'

আরে সেই জন্যেই তো বললাম,' নিখিলেন্দ্র আবার টুপিটাকে মাথায় বসিয়ে তাঁর সেই পেটেন্ট কৌতুক হাসিটি হেসে বলেন, 'সমাজটাতো আমি'কে বাদ দিয়ে নয়। যদিও আপাততঃ আমি সমাজের কেউ নই। আমি মৃত।'

আর কি কথা এগোত কে জানে, এই সময় ব্রজেন এবং সুখেন উভয়ে মিলে অতিথি সৎকারের উপচার নিয়ে এসে হাজির করে।

ব্রজেনের হাতে ট্রেতে কফির সরঞ্জাম লেশের ঢাকনি ঢাকা, সুখেনের হাতে ট্রেতে চারটে প্লেট, চারখানা চামচ, ও দুটো প্লেট ভর্তি বিস্কিট ও কাজুবাদাম আখরোট কিসমিস।

এ বুদ্ধি অবশ্য ব্রজেনেরই।

বিনা নির্দেশেই করতে হয়। তাকে এসব, যদিও কদাচই কেউ আসে এখন। কিন্তু যে লোক এসে রাজাসাহেবের সামনে সোফায় বসবার গৌরব লাভ করেছে, তাকে তো আপ্যায়ন করতে হবে! কে জানে কলকাতার কোনো আত্মীয়ই কিনা যে রকম সপ্রতিভভাবে বসেছে, কথা বলছে। কলকাতাতেই তো কর্তার সর্বস্ব'।

'অতিথি সৎকারের এই আয়োজনেও চমৎকৃত হয় এরা।

শিপ্রাই কফি ঢালে এবং প্রথমেই প্রশ্ন করে, আপনাকে দিই?'

নিখিলেন্দ্র যেন অবাক হন, অসময়ে তাকে কেউ কিছু খাবার অফার করছে। অদ্ভুত বৈকি! অবশ্য সে সব কিছু বলেন না, আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'না, আমার হ'য়ে গেছে। তোমরা খাও।'

'এত সব—'

বলে ওরা একটু একটু তুলে নেয়।

আর খেতে খেতে দারুণ সপ্রতিভ ভাবে বলে ওঠে, 'দেখলে তো স্বদেশ, আমার কথা শুনে তখন এলে আর তোমাদের পয়সা খরচ করে চায়ের দোকানের ওই বিশ্রী চা খেতে হত না।'

তিন তিনটে ছেলেই খাওয়া ভুলে ওই সপ্রতিভ মুখটার দিকে হাঁ করে তাকায় মেয়েজাতটা কী! ওরা কী পারে আর কী না পারে।

নিখিলেন্দ্রকে কি আজ হাসিতে পেয়েছে? নইলে ওর এই অভব্য কথাতেও আবার হেসে ওঠেন···আবার সেই কথা মনে হল শিপ্রার।

রাজর্ষি বলল, 'রিকসাওয়ালাটাও কিন্তু বারণ করেছিল।'

শিপ্রা বল, 'রিকসাওলার কথাই শুনতে হবে, তার কোন মানে নেই।···আসলে কী হল' বাগানটা দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল—'

একটু থামল, একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, 'দেখে তো বোঝা যায়, কত সুন্দর ছিল আগে। তখন মালির কাছে শুনলাম, রাজবাড়িতে এখনো রাজা আছেন, খুব ইচ্ছে হল দেখি। তাছাড়া—

পাশ থেকে নন্দন ওর পিঠে দারুণ একটা চিমটে কাটল, কিন্তু তখন তো হাতের ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, তাছাড়া টাইটেলটা শুনে বোকার মত একটা কৌতুহল হল। আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ে, তার পদবীও ভঞ্জচৌধুরী। আর শুনেছি এই নর্থের দিকেই তার বাড়ি। তাই না—'

স্বদেশ আর পারে না, বলে ওঠে, 'আ, শিপ্রা, কী বাজে কথা বলছ?'

ওই বাজে কথাটার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সেটা কারুর নজরে পড়েনি।

নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরীর সমস্ত ভঙ্গীটা যে একবার ভারী উত্তেজিত দেখাল, তা কেউ টের পেল না।

তবে কথাটা তিনি খুব নির্লিপ্ত গলাতেই বললেন, ভঞ্জচৌধুরী। তাই নাকি? নাম কী?

'লেখে মনুজ চৌধুরী, কিন্তু শুনেছি আসলে ওরা ভঞ্জচৌধুরী।'

নিখিলেন্দ্র তাঁর পেটেন্ট কৌতুক হাসিটা হেসে বলেন, 'ফালতু মালটা বাদ দিয়েছে? তা ভাল। তা তাকে হঠাৎ এখানের মনে মনে হল যে? রাজপুত্তুরের মতন চাল ফলিয়ে বেড়ায় বুঝি?'

'মোটেই না।' শিপ্রাই যেন একটু উত্তেজিত হয়। 'খুবই সাধারণভাবে থাকে। আমার এমনি মনে হল। আচ্ছা আমরা তাহলে যাই, এখন যখন কিছু দেখা যাবে না—'

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'কদিন আছ তোমরা এখানে ? কাল সকালে এসো না। দেখবার মত কিছু নেই অবশ্য আর, তবু মিউজিয়ামেও তো যায় লোকে ? মমি দেখে।···মদন, তুমি বরং কাল সকালে এঁদের সব মহলগুলো দেখিয়ে দিও। নাচঘর, লাইব্রেরী, অস্ত্রাগার, কিউরিওর ঘর, রান্নাশালা, ভোজনশালা।'

'আমরা কিন্তু কাল সকালেই চলে যাচ্ছি—'

বলল নন্দন।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি বলে' 'সকালে কোথায় বাঃ। এগারটার বাসে তো যাচ্ছি আমরা—'

'সেটাই সকাল, নন্দনের স্বর দৃঢ়, 'তার আগে আর এতদূর আসা সম্ভব নয়।'

তবে আর কী করা ? মদন উপযুক্ত আলো বোধহয় সব জায়গায় নেই ?'

মদন মাথা চুলকে যা বলে, তা শুনতে পাওয়া না গেলেও মানে বোঝার অসুবিধে হয় না।

নেই।

নেই। রাজবাড়ির আর কিছুই নেই বুঝলে ?' নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরী দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'শুধু এই অমর বুড়োটা ছাড়া।'

শিপ্রা ফিরে দাঁড়ায়, হাসিমুখে বলে, মোটেই আপনি বুড়ো নন।'

'নয় বুঝি ?'

নিখিলেন্দ্র আবার গুছিয়ে আরামচেয়ারে বসে বলেন, তাহলে আরো কিছুদিন পৃথিবীর আলো বাতাস ভোগ করবার অধিকার আছে বলছ ?'

অনে—ক দিন।'

বলে এখন শিপ্রা 'আচ্ছা যাই' বলে নিখিলেন্দ্রনাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। এবং 'যাই' বলেও চোখ তুলে তুলে দেয়ালে ঝোলানো

ছবি দেখতে থাকে। এখানে অন্য কিছু নয়, না তৈলচিত্র, না শিল্পীর হাতে আঁকা নিসর্গচিত্র শুধু ফটো আছে। পারিবারিক ফটো। গ্রুপ একক।

'এ-ছবি কার?'

চমকে থমকে দাঁড়ায় শিপ্রা, 'এই বন্দুক হাতে?'

নিখিলেন্দ্র জানেন কোন দেয়ালে কী ছবি।

দীর্ঘকাল তিনি বাড়ির বাইরে যাননি, প্রাসাদের একতলায় নামেননি, নিজের মহল ছাড়া অন্য কোন মহলেও যাননি। ঘর আর বারান্দা, এই তাঁর গতিবিধি।

কতকাল?

মহালক্ষ্মী মারা গেছেন কতকাল?

মাতাল দুশ্চরিত্র সেই ছেলেটা, আর উদ্ধত অবিনয়ী তার সেই বৌটা? তারাই বা চলে গেছে কতকাল? অনেকদিন, অনেকদিন। ...তবু নিখিলেন্দ্র আরো অনেকদিন এ-পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করতে চান। আশ্চর্য বৈকি!

শিপ্রার কথায় নিখিলেন্দ্র কিছু বলার আগেই গরুড় অবতারের মত হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মদন ঘোষ বলে ওঠে, 'রাজা সাহেবের যৌবন কালের। মস্ত বড় শিকারী ছিলেন তো!

শিপ্রা ও-কথা কানে নেয় না, শিপ্রা সেই ছবির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে বলে, 'কী আশ্চর্য! মনে হচ্ছে এ ছবি আমি দেখেছি।'

বেরিয়ে গিয়েও সে-কথা বলে শিপ্রা, 'মনে হচ্ছে ওই লোককে আমি কোথায় দেখেছি। ছবিটা দেখেও তাই মনে হল।'

'তাহলে বোধহয় স্বপ্নে দেখেছ।'

বিদ্রূপ ঝলসে ওঠে ওদের চোখে, 'তাই দেখবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলে।'

শিপ্রা নিজেই ঝলসে উঠে বলে, 'গিয়ে তোমাদের কিছু লোকসান হয়েছে ? দিব্যি কফি খেলে, কাজু খেলে, বিস্কিট খেলে—'

'খেলে কী হবে, কীরকম একটা অকোয়ার্ড পজিশান সেটা ভেবে দেখেছ ?'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, আমার জন্যে তোমাদের কিছু ক্ষতি হয়েছে, হল তো ?

'যাক ওই সুবে বাংলার নবাবের মত চেহারার লোকটা যে অন্ততঃ মনুজের ঠাকুর্দা নয়, এটা মানছ তো ?'

শিপ্রা অন্যমনাভাবে বলে, 'না মেনে উপায় কি ! শুনেছিলাম তো দারুণ বুড়ো ওর ঠাকুর্দা।'

'ঠাকুর্দারা বুড়োই হয়।'

বলে প্রসঙ্গে যবনিকা টেনে তিনজনে তিনটে সিগারেট ধরায়।··· রিকসাওলা দুটো নিরাপদ দূরত্বে কোথায় ছিল ওদের দেখে চলে আসে তাড়াতাড়ি।

ওরা চলে গেলে, নিখিলেন্দ্রনাথ খুব দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন। দুই হাত পিঠের দিকে একত্রে মুষ্টিবদ্ধ। এ-ভঙ্গী ইদানীং আর দেখা যায় না নিখিলেন্দ্রর। আজই হঠাৎ।

এ-ভঙ্গী অধীরতার, অসহিষ্ণুতার, অস্থিরতার, চাঞ্চল্যের।

ওই ছেলে-মেয়ে তিনটে তাঁকে ভাবিয়ে তুলে গেল।

কেন এসেছিল ওরা ?

মনুজ চৌধুরী নামের সেই ছেলেটা, যে-ছেলেটা নামের এবং পদবীর খানিকটা করে বাদ দিয়ে বাহাদুরী দেখিয়ে বেড়ায়, এরা কি তার প্রেরিত ? সে কি আসতে চায় ? তাই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চর পাঠিয়েছে ? না কি রাজবাড়ি দেখবার ছল করে আসা দলটাকে রাজবাড়ির অর্থ সম্পদের হিসেব নিতে পাঠিয়েছে ? ওদের আসাটা নিঃসন্দেহে সন্দেহজনক।

ওরা কি আমায় খুন করতে চায়? তাই আমার রাইফেল-হাতে কটোটা দেখে চমকে উঠল?···

তালপুকুরে এখন 'ঘটি ডোবে না ঠিকই, তবু এরকম একটা পুরনো ধনী লোকের বাড়ি, একদা যাদের রাজা টাইটেল ছিল, তাদের কাছে এক আধটা রাইফেল-রিভলভার থাকবে, এটুকুও তার ধারণায় ছিল না?

কর্তার ভাব দেখে ব্রজেনও কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। কোথা থেকে যে ওই ছোঁড়াছুঁড়ি ক'টা এল, যেন নিথর পুকুরে ঢিল ফেলে গেল।

কিন্তু ভয় করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না। ডিনারের সময় পার হয়ে গেলেও তো ব্রজেনের ফাঁসির হুকুম। নিজের কাজ করে চলেছে। অতএব ব্রজেন ডাইনিং রুমে গিয়ে কাঁটা চামচের টুং টাং শব্দ করে কাশে, গলা ঝাড়ে।

অতঃপর বৃহৎ এক টেবিলের মাঝখানে একজনের ডিনার সাজায়। ছুরি কাঁটা চামচ ন্যাপকিন, অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছু নেই।··· ব্যতিক্রমের মধ্যে আজ নিজে জানাতে না গিয়ে সুখেনকে পাঠায়।

নাঃ ভয় পাবার কিছু ছিল না, নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরী একটু চিত্ত-চাঞ্চল্যের জন্যে নিয়মের ব্যতিক্রম করে বসবেন এ হয় না।

ঘড়ির পাখি যখনি জানিয়ে দিয়েছে 'সময় হল, সময় হল' তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে বৈকালিক প্রসাধন বদলে ডিনারের সাজে সজ্জিত হয়ে ডাইনিংরুমে চলে এসেছেন নিখিলেন্দ্র।

টেবিলের মাঝখানে কাট্-গ্লাশের ডিক্যান্টার, কাট গ্লাশেরই নুন মরিচ লঙ্কার গুঁড়োর আধার তবে খাবার ডিশ গ্লাশ আর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিগুলো রুপোর।

ডজন ডজন রৌপ্যনির্মিত সেট ছিল, সেগুলো কি আছে?

মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় নিখিলেন্দ্রর, কিন্তু যাবে

কোথায় ? মহালক্ষ্মী মারা যাবার পর থেকে যাবতীয় চাবিই তো নিখিলেন্দ্রর কাছে। লাইব্রেরী ঘরের চাবিটাই শুধু ব্রজেনের কাছে থাকে। সে মাঝে মাঝে ঝাড়ে মোছে।

নিখিলেন্দ্রকে যথারীতি কালো স্যুট পরে খেতে আসতে দেখে এবং উঁচুপিঠ সিংহাসন প্যাটার্ণের চেয়ারগুলোর মধ্যে তাঁর নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারটায় এসে বসতে দেখে ব্রজেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পোশাকটা নিখুঁত বিলিতি হলেও খাদ্য-তালিকায় মিশেল আছে। আর সে মিশেলের অভ্যাসটি মহালক্ষ্মীই ধরিয়ে দিয়েছিলেন আস্তে আস্তে।···নিজের হাতের কিছু অবদান, নিজের তদারকীতে প্রস্তুত কিছু, এ তিনি তাঁর স্বামী-পুত্রকে খাওয়াতে ভালবাসতেন।

পুত্র অবশ্য বিদায় নিয়েছিল এ-সংসারকে ছত্রখান করে, স্বামী ছিলেন শেষ অবধি। আর ওই বেদনাহত নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে সেই দুর্ধর্ষ মানুষটা ক্রমেই যেন শান্ত হয়ে আসছিল। অতএব নিখিলেন্দ্রর খাদ্যতালিকা বহুমুখী।···একটির পর একটি এগিয়ে দেয় ব্রজেন, আর সেগুলো খেয়ে চলেন বৃদ্ধ একটির পর একটি।···কিছু ফ্রায়েড-রাইস, কিছু ফুলকো লুচি, কিছু চাপাটি, দু-একখানা পাঁউরুটির স্লাইস, এসব ব্যতীত ডাল, ভাজাভুজি, কপির তরকারি, সুপ, স্যালাড, আর তার সঙ্গে সেই আস্ত মুরগীর ঝোল, খাদ্যতালিকায় যা অপরিহার্য।

সব মিলিয়ে যা পেটে চালান করেন এ-যুগের তিনটে জোয়ান ছেলে পেরে উঠবে না। অথচ খাওয়ার মধ্যে মুখে আগ্রহের ছাপ, লোভের ছায়া, আসক্তির রূপ ফুটে ওঠে না, যা ফুটে ওঠে সে হচ্ছে নিরাসক্ত ভোগী পুরুষের মুখের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা।

ব্রজেনের খুব ইচ্ছে করছিল, সেই ছেলে মেয়েগুলোর ব্যাপার কিছু আলোচনা হোক, কিন্তু নিখিলেন্দ্র যেন ওদিকটায় তালাচাবি দিয়ে ফেলেছেন।

অথচ এমনি কথা বলছেন, 'রান্নার হাতটা সতীশের দিনে দিনে চমৎকার হচ্ছে বলে দিস দেখা হলে।'···ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেল, এখনো শীত তেমন জমকালো হল না দেখেছিস ব্রজেন ?'

এর উত্তরে আর বলার কী আছে ? 'আজ্ঞে তাই তো দেখছি' ছাড়া ?

'রাজাসাহেবের খাওয়া মিটলে ব্রজেনের আজকের মত ছুটি।··· শেষ হলে হাঁপ ফেলে বাঁচে।···তারপর আর একটা কাজ সারা দোতলায় তালাচাবি লাগানো।

আজ আবার মুখেও তালাচাবি লাগাতে হয়েছে।···কী সুখেরই জীবন ব্রজেনের। সারা জীবন শুধু ভয়ে ভয়েই থাকতে হল !

'তোমাদের শীতকালীন সফর শেষ হল ?'

হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এল মনুজ শিপ্রার দিকে।···ক'দিন টো টো করে বেড়িয়ে শিপ্রার রংটা ময়লা হয়ে গেছে যেন একটু। আর বেশ ক্লান্তও দেখাচ্ছে। আবার বলল, এই ক'দিনেই চেহারাখানি তো বেশ বাগিয়ে এসেছ দেখছি। চেঞ্জটা ভালই লেগেছে বলতে হবে।'

শিপ্রা এই দুটো কথার একটারও উত্তর দিল না, শুধু গভীর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

'কী হল ? চিনতে পারছনা না কি ?'

শিপ্রা বলল, 'পারছি কিনা দেখছি চেষ্টা করছি।'

মনুজ আবার শিপ্রার শুকনো শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলে 'সেটা বরং আমারই করার কথা। তোমাকে চিনতে সময় লাগছে। কী করেছিলে ? এই সাতদিন খাওয়া দাওয়া করনি ?'

শিপ্রা কিন্তু এসব কথার জবাবের ধার দিয়ে না গিয়ে বলে, আচ্ছা মনুজ, নর্থের কোথায় যেন তোমার দেশ শুনেছিলাম, সেটা কোথায় ?'

মনুজ অবহেলার গলায় বলে, 'হঠাৎ আমার দেশঘরের নাম জানবার কী হল ?'

'বলতেই বা কী হচ্ছে? যাবার আগে একবার জানতে চেয়েছিলাম, তখন বললে না, এখনো বলছো না, মানে কী? তুমি কি পলাতক আসামী?'

'ধরেছ তো ঠিক।' বলে হেসে ওঠে মনুজ।

আর তখনই চড়াৎ করে বিদ্যুৎ শিখা যেন মাথার এদিক থেকে ওদিকে খেলে যায় শিপ্রার। জেনে যায় সেই হাসিটা কোথায় দেখেছিল সে?

কিন্তু ও ছেলে কি ধরা দেবে?

কী তবে ওর ভিতরের রহস্য?

তবু শিপ্রা পার্কের বেঞ্চটায় বসে পড়ে বলে, 'আচ্ছা মনুজ, তোমাদের সেই দেশের বাড়িতে কে কে আছে তোমার?'

মনুজ শিপ্রার ওই তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারে না। ও কি তবে গিয়েছিল সেই দেশটায়, যে দেশের নামটাও উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করে না মনুজের।

কিন্তু তাতে কী?

বেশী জেনে কী হবে ওর?

দেখছেই তো মনুজ অনিচ্ছুক। না কি সেখান থেকে অধিক কিছু জেনে এসেছে শিপ্রা নামের জেদী একগুঁয়ে মেয়েটা?

জেদী একগুঁয়ে, এককথায় রেগে ওঠে, শিপ্রার এরকম অনেক দোষ আছে, তবু শিপ্রা শিপ্রাই। দোষগুণের বাইরে নিজজন। তাই শিপ্রাকে দেখলেই মনের তারগুলো আপনিই বেজে ওঠে। শিপ্রা কথা কইলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয় না। শিপ্রা হেসে উঠলে সমস্ত পরিবেশটা আলোয় ঝলসে ওঠে।···শিপ্রার সঙ্গে ক'দিন দেখা হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা যেন খাপছাড়া হয়ে গেছে।···

শিপ্রার উপর রাগও এসে যাচ্ছিল, মনুজকে কলকাতায় রেখে

গিয়ে ওই রাজু নন্দন আর স্বদেশের সঙ্গে টো টো করে বেড়াতে এত ভাল লাগছে শিপ্রার।

কিন্তু রাগ করা চলে না, মনুজকে শিপ্রা অনেক খোশামোদ করেছিল।

'বলনা তোমার আর কে আছে সেখানে?'

মনুজকে অগত্যা উত্তর দিতেই হয়, 'ওইতো, বলেছিলামও বোধ-হয় একদিন। একমেবাদ্বিতীয়ং আমাদের ঠাকুর্দা থাকেন।'

'আর কেউ না?'

'আর?'

মনুজ বলে, 'আরতো অনেক চাকর-বাকর আছে শুনেছি, আমি আর কবে দেখেছি বল? খুব ছেলেবেলাতেই তো চলে এসেছি।'

'আর যাওনি?'

শিপ্রার যেন এই উত্তরটা না পেলেই নয়। যেন এই উত্তরটাই তার জীবনমরণ!

এর অর্থ বুঝে উঠতে পারে না মনুজ।

তবু সে প্রশ্ন না করে বলে, 'আর যাইনি।'

'কেন? ঝগড়া করে চলে এসেছিলে?'

মনুজ হেসে ফেলে বলে, 'যেভাবে পুলিশী জেরা শুরু করছ, ভয় লাগছে।'

'প্রকৃত জবাবটা এড়িয়ে যেতে চাইছ কিন্তু।'

মনুজ এবার গম্ভীর হয়, 'কোন কিছু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা আমি করি না শিপ্রা, শুধু বলছি, আমার ওই 'দেশে'র প্রসঙ্গ ভাল লাগে না।'

শিপ্রা মলিন মুখে বলে, 'কিন্তু আমার যে দারুণ একটা খটকা লেগে রয়েছে মনুজ, কী করি বলতো?'

মনুজ হতাশ হয়ে বলে, 'ক'দিন রোদে ঘুরে ঘুরে তোমার মাথার

গোলমাল হয়ে গেল নাকি বলতো শিপ্রা ? আমার একটা পরিত্যক্ত অতীত নিয়ে তোমার কিসের খটকা ?'

'আছে।' শিপ্রা এখন মাথা ঝাঁকিয়ে কড়া গলায় বলে, 'না থাকলে এত খোসামোদ করব কেন ? আমার কাছেও তুমি কথা চাপবে ? আমি চাপি ?'

মনুজ তাকিয়ে দেখে।

শিপ্রা ফর্সা নয়, বরং কালোর দিকেই। ওরা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলে গেলে, মনুজের পছন্দের তারিফ করে না কেউ। তবু শিপ্রার চোখে মুখে এমন একটা দ্যুতি আছে, যা আকৃষ্ট না করে পারে না।

সেই দ্যুতির দিকে তাকিয়ে দেখে মনুজ। শিপ্রার ভঙ্গী খুব উত্তেজিত, মনুজ অস্বস্তি বোধ করে, শিপ্রাকে ঠিক এই অবস্থায় যাহোক বলে বোঝাবার চেষ্টা করতে গেলে আহত হবে, অপমানিত হবে। কিন্তু হ'লটা কী ?

তবু মনুজ হেসে বলে, 'তোমার আবার চাপবার কী আছে ?'

'কেন, দাদা বৌদির মধ্যে দারুণ কাণ্ড চলেছে, বৌদি ডিভোর্স কেস ঠোকবার জন্যে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে, বলিনি তোমায় ? আর কাউকে বলতে গেছি সে কথা ?'

মনুজ ওর রাগে অভিমানে উদ্বেলিত মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'যে কথা আমি নিজেই ভাল করে জানি না, সেকথা বলি কী বলতো ? জানি ঠাকুর্দা আছেন, কারণ তাঁর সেই থাকাটা নিয়ে দাদাদের মধ্যে খুব উত্তেজিত আলোচনা দেখি তাই—'

শিপ্রা অবাক হয়ে বলে, 'আলোচনা টা উত্তেজিত কেন ? উনি তো তোমাদের থেকে অনেক দূরে থাকেন, কোনো জ্বালাতন করার সুযোগ পান না তো। মানে, মনে কিছু করো না, বুড়োটুড়ো হলে মানুষ কিছু জ্বালাতন টালাতন করে তো ! অবুঝ হয়ে যায়—'

মনুজ মৃদু হেসে বলে, 'ওঁর এই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকাটাই জ্বালাতন করা শিপ্রা, যথেষ্ট অবুঝের কাজ। একটা লোক আশী নব্বই বছর ধরে কেন পৃথিবীর জায়গা জুড়ে থাকবে? ওই সময়ের মধ্যে আরো কত লোক এসে যাচ্ছে পৃথিবীতে, তাদের জায়গা কুলচ্ছে না—সে খেয়াল থাকবে না?'

শিপ্রা তীক্ষ্ণ হয়, বলে, 'এটা ভাবা অমানবিকতা। বাঁচা মরা কারো নিজের হাতে নয়। তাছাড়া নিজের লোকেরা ওকথা ভাববে?'

'নিজের লোকেরাই তো বেশী করে ভাববে শিপ্রা, প্রশ্নটা যে তাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে সম্পত্তি টম্পত্তির ব্যাপার থাকলে। ঊর্ধ্বতনেরা যতক্ষণ না অন্তর্হিত হচ্ছে, অধস্তনেদের হাতে তো আসছে না। এটা অসহ্য নয়? যে লোকটা আর পৃথিবীর কোন কাজে আসছে না, সে লোকটা অকারণ কতকগুলো বাড়তি দিন বেঁচে থেকে, ভুগে অথবা ভোগ করে, তার সঞ্চিত অর্থের খানিকটা অংশ বসে বসে কমাচ্ছে, এটা সহ্য করা কম শক্ত?'

শিপ্রাও হতাশ গলায় বলে, 'পৃথিবীটা কা নোংরা! সে তার নিজের সঞ্চিত অর্থ ভোগ করছে, তাতে কার কী?'

'সে মরলে যারা নিশ্চিন্তচিত্তে সেটা ভোগ করতে পারে, তাদের তো সবটাই অসুবিধে শিপ্রা! আমার দুই দাদাকেই তো সেই অসুবিধের জ্বালায় ছটফট করতে দেখি।'

শিপ্রা হতাশের ভঙ্গীতে বেঞ্চের পিঠে ঘাড় এলিয়ে বসেছিল, এখন সোজা হয়ে উঠে বসে বলে, 'তবে তুমিই বা নয় কেন?'

'নই কেন?'

মনুজ হেসে ওঠে, 'সে উত্তর দেওয়া তো শক্ত। সবাই একরকম নয় বলেই হয়ত।'

'তবে এও বলি, তোমার আবার অনেক বাড়াবাড়ি। এমন

অভাবগ্রস্তের মত থাক! তোমার দাদারা তো ট্যাকসী ছাড়া বেড়ায় না, দেখি তো যখন তখন—'

'দেখ নাকি?'

'কত সময়। বড় হয়ে যাওয়া দুই ভাই একসঙ্গে ঘুরছে এটা তো দ্রষ্টব্য, তাই চোখে পড়েও যায়। দু'জনে এত একসঙ্গে যায় কোথায়?'

এতদিন পরে দেখা শিপ্রার সঙ্গে, মনুজের ইচ্ছে হচ্ছিল শিপ্রাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যায়, অথবা কোনো সত্যিকার খোলামেলা জায়গায় দুজনে চুপচাপ বসে থাকে, কেউ কোন কথা কইবে না, শুধু সান্নিধ্যটুকু উপভোগ করবে, যেমন ঘটেছে এক একদিন। একদিন তো শিপ্রাদের বাড়িতেই হয়েছিল, মনুজ গিয়েছিল, কেউ ছিল না সেদিন তখন ওদের বাড়িতে (আছেই বা কে যে থাকবে? দাদা আর বৌদি। বৌদিও তো আপাতত বাড়ি ছাড়া।) চাকর বলল, 'দিদি ছাতে', সোজা ছাতে উঠে গিয়েছিল মনুজ।

শিপ্রা তার ছাতের বাগানের পরিচর্যা করছিল, মনুজকে দেখে আলোয় ভরে গিয়ে বলে উঠেছিল, 'মনুজ!' শুধু ওইটুকু। মনুজ ওর বাগানের প্রশংসা করেছিল একটু, আর শিপ্রা সেই দিন ওর দাদা বৌদির ভিতরের ভাঙনের কথা বলে ফেলেছিল একটু, তারপর দু'জনেই স্রেফ চুপ হয়ে গিয়ে বসেছিল।

অদ্ভুত ভাল লেগেছিল সেদিন।

পড়ন্ত বেলার আকাশে মেঘগুলো নানারঙে নেয়ে নেয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে গড়ন বদলাচ্ছিল—পাহাড় থেকে হাতি, হাতি থেকে মানুষ, রবীন্দ্রনাথ, শিবাজী, আবার ভেঙেচুরে অবয়বহীন একরাশ পেঁজা তুলো, এসব যেন জীবনে সেই প্রথম দেখেছিল মনুজ।···

তেমনি ইচ্ছে করছিল আজ, কিন্তু অকল্পনীয়ভাবে শিপ্রা এমন

এক প্রসঙ্গ তুলে বসল! কে জানে কোথায় কি শুনে বসেছে, কী ধারণা গড়ে উঠেছে! কিন্তু বিমনা হয়ে চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না, উত্তরের প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছে শিপ্রা। যেন মন্তুজের সব কথা ওর শুনতেই হবে, এবং সেই শোনাটা হবে যেন অধিকারের দাবিতে।

মন্তুজকে অতএব বলতেই হয়, কোথায় এত যায় তুজনে একসঙ্গে? 'খুব সম্ভব সই জাল করা শিখতে, আর সেই জাল সইয়ের জোরে সম্পত্তিটম্পত্তি পাচার করতে।'

শিপ্রা প্রায় ঠিকরে ওঠে, তীব্র আর্তনাদের মত বলে, 'তার মানে?'

'জানি তুমি চমকে যাবে। তবু শুনতেই যখন চাইছ, তখন বলি—ভঞ্জচৌধুরীর বংশের সেই অমর অবিনশ্বর মূল মালিকটি না মরলে এবং যথাযথভাবে সম্পত্তি হাতে না পেলে তো কিছু বিক্রী করে দেওয়ার অধিকার থাকবে না। কী আর করে অভাগারা! ওরা যে রাজবাড়ীর ছেলে একথা কিছুতেই ভুলতে পারে না বলে রাজাইচালের কিছুটাও চালাতে চায়, অতএব ধারের পর ধার বাড়ায়। আবার ধার করে শোধ করে। কিন্তু সবেরই তো একটা সীমারেখা আছে? নাম ভাঙিয়ে ধার পাওয়া আর সম্ভব না হওয়ায় ক্রমশ সিন্ধুক ভাঙছে।···দেশের যেসব কর্মচারিকারি আছে, তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একধার থেকে মাল পাচার করছে।···এঁরা খদ্দের ঠিক করে পাঠান, তারা নিঃশব্দে সাপ্লাই করে। অবশ্য মোটা কমিশন না নিয়ে কি আর ছাড়ে? তুচারটে দলিলফলিলও বাগিয়েছে শুনেছি। কোন কোন তীর্থস্থানে নাকি বাড়ি ছিল রাজাদের, মানে রাজ-রাজড়াদের যা হয়ে থাকে। ধর্ম এবং অধর্ম তুজনকেই সমান স্নেহে লালন করে থাকেন তাঁরা, এঁরাও তাই করেছেন। সেইসব ছোটখাটো বাড়িগুলো, পুরী কাশী বৃন্দাবন হরিদ্বার গোছের জায়গায় আর কি,

একে একে সমাধা করে এখন বসতবাড়ির জিনিসপত্রে টান পড়েছে। অবশ্য কেবলমাত্র দাদাদেরই দোষ দিতে পারি না, বাবাই এর উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়ে গেছেন। যাক্ শোনাতো হল সব, এখন একটু ভাল কথা বল।'

শিপ্রা গম্ভীরভাবে বলে, 'কিছুই শোনা হয়নি। এ সমস্ত জেনেটেনেও তুমি ওঁদের বাধা দাও না?'

'আমি?' মনুজ বেশ গলা ছেড়ে হেসে ওঠে, 'আমি কে? আমি একটা অধমাধম, আমার কি দরকার ওদের ব্যাপারে নাক গলাবার?'

'তুমি কি ওবাড়ির ছেলে নও?'

খুব উত্তেজিত প্রশ্ন করে শিপ্রা।

শিপ্রার মাথার মধ্যে সেই বিরাট প্রাসাদখানা ঢুকে বসে আছে, শিপ্রা তার সঙ্গে মিলোতে বসেছে 'মনুজ' নামের এই শূন্যপকেট ছেলেটাকে। দুজনে চা খেলে শিপ্রাকেই বিল মেটাতে হয়, মনুজ উদাত্তভাবে বলে, 'লিখে রাখ, পরে শোধ।'

অথচ ওর দাদারা?

গায়ে জ্বালা ধরে শিপ্রার।

আর জ্বালাটা বাড়ে যখন মনুজ বলে, 'বংশটাকে অবশ্য অস্বীকার করতে পারি না কিন্তু নিজেকে কোনো এক মৃত রাজবাড়ির ছেলে বলে ভাবতে পারি না, কখনো। ওতে আমার অ্যালার্জি!'

'তোমার জ্ঞাতসারে একটা অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে, এতেও তোমার কিছু করার নেই?'

মনুজ একটু হেসে বলে, 'পৃথিবীতে আমার জ্ঞাতসারে এত বেশী পরিমাণে অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে যে, ওটা মনে হচ্ছে কিছুই নয়। বরং ভেবে দারুণ হাসি পায়। নিজেরই জিনিস নিজে সরাচ্ছি জালজোচ্চুরি ষড়যন্ত্র করে, অন্যকে কমিশন খাইয়ে, ভাবলে হাসি পায় না?'

শিপ্রার কিন্তু হাসি পায় না, রাগই হয় বরং। শিপ্রা অজ্ঞাতসারে নিজেকে মনুজের ভাগের দাবীদার বলে ভাবছে এখন। তাই জেদের গলায় বলে, 'আমার হাসি পাচ্ছে না, আমার রাগ হচ্ছে!'

'ভাল। তাহলে না হয় রেগেটেগে বসে থাক, আমি যাই।'

'বাঃ এক্ষুণি যায়? চা খাব বললাম না?'

'বললে বুঝি? কখন বললে?'

'মনে মনে বলেছি। চল। কিন্তু তবু একটা কথা আমায় বলতেই হবে মনুজ, সত্যিই কি তোমার দাদু ছাড়া আর কেউ নেই তোমাদের সেই বাড়িতে? জ্যাঠা, কাকা? ঠিক তোমার মত মুখ?'

'হোপলেস!'

মনুজ বলে, 'কী যে একটা ঢুকে বসে আছে তোমার মাথায় জানি না। কাকা জ্যেঠা? শব্দটা আমার কাছে স্বর্গীয় বলে মনে হচ্ছে। আর 'দাদু'? এ শব্দটাও অলৌকিক। পিতামহ বলে একজন আছেন তাই জানি, কিন্তু দাদু? না এরকম অন্তরঙ্গ ডাক ডাকবার সুযোগ কোনোদিন হয়নি রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্র ভঞ্জ-চৌধুরীকে।'

নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরী!

শিপ্রা নিঃসংশয় হয়। বলে ওঠে, 'যাক এতক্ষণে স্বীকার করলে। তবে বলি আমি, এই আমি শ্রীমতী শিপ্রা রায় তোমার বাড়ি বেড়িয়ে এসেছি, তোমার বাগান দেখে এসেছি, যাকে সবাই রাজবাগান বলে।'

মনুজ গভীর গম্ভীর গলায় বলে, 'এইরকম কিছু একটা ঘটেছে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এতে এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন শিপ্রা? ওই পাথরের প্রাসাদের সঙ্গে কিছুতেই আমার কোন যোগসূত্র খুঁজে পাই না আমি।'

'কিন্তু তোমার চেহারা তোমায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে দেবে না মনুজ, সারাজীবন সে তোমায় স্মরণ করিয়ে দেবে তুমি ওদের!...শুধু

একটা ব্যাপারে সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি না, রাজাসাহেব বলে যাঁকে দেখাল আমায়, তিনি কী করে তোমার পিতামহ হতে পারেন? একদিন বলেছিলে তাঁর বিরাশী তিরাশী বছর বয়েস—'

'এখনো তাই বলছি।'

'অথচ আশ্চর্য—' শিপ্রা যেন সেই শীত সন্ধ্যার কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে তলিয়ে গিয়ে আচ্ছন্ন গলায় বলে, 'তিনি তো অত বয়সের নয়?···সোজা সতেজ তাজা চেহারা, সব চুল কালো কুচকুচে, পোশাকটা ঠিক নবাবটবাবদের মত। আমি যেন গোলকধাঁধায় পড়ে গেছি। আমার মনে হয় মনুজ, তোমাদের ওই বাড়িতে হয়ত আরো কেউ আছে, তুমি জান না। অথচ তুমি তাঁর মত দেখতে। আমি তোমার মার কাছে একদিন যাব মনুজ!'

এ কথায় মনুজ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে। কী ভেবেছে শিপ্রা? মনুজের সঙ্গে তার জীবনটা জড়াতে বসেছে, এই ধারণায় মনুজের গার্জেন হয়ে যাবে?

মনুজ তার বিরক্তি গোপনও করে না।

খুব দৃঢ় গলাতেই বলে—'মার কাছে তুমি যেতে পার একশোবার, কিন্তু কিছুতেই এ নিয়ে কিছু বলবে না। আমার মার জীবনটা একটা ট্র্যাজেডি, তাঁর দুঃখের উপর আর দুঃখ যেন আমরা নিজেরা না বাড়াই শিপ্রা!'

'আর তাঁর ওই ছেলেরা যা করছে? তাতে কি তিনি খুব সুখী?'

'মার জীবনের সব থেকে বড় দুঃখ তো ওই। ওখানে হাত ঠেকাতে যাওয়া পাপ।'

মনুজের কথার মধ্যে কখনো সেন্টিমেন্টের ছাপ দেখেনি শিপ্রা। আজ দেখল। আর এ প্রসঙ্গ চালিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন শিপ্রাকে সাপের মত ছোবল দিচ্ছে।

সেই রাজাসাহেব নামের ভদ্রলোক যদি মনুজের দাদু না হয়, তো কে সে? কী তার পরিচয়?···মনুজ কেন তার মত দেখতে?

মনুজের মা কি পরিত্যক্তা? না কি স্বামীত্যাগিনী? এ রহস্যভেদ করতে না পারলে শিপ্রার পায়ের তলার মাটি কোথায়? মনুজকে ছাড়া জীবনটা তো ভাবতে পারে না আর।···শিপ্রা কেন অত জেদ করে রাজবাড়ি দেখতে গেল? পরে তো ভেবে ছেলেগুলোর কাছে লজ্জাই করেছে। অথচ তখন যেন কে, যাকে বলে সেই 'শতবাহু দিয়ে আকর্ষণ' তাই করছিল।···কেন?

অবশেষে এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিল শিপ্রা, একেই বোধহয় বলে 'নিয়তি'।

কিন্তু সান্ত্বনা দিলেই কি শান্তি মেলে?

নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরীর একমাত্র পুত্রবধূ সুন্দরী তুষারকণাও তো তাঁর জীবনের সমস্ত যন্ত্রণাকে 'নিয়তি' বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছেন, তবু সে সান্ত্বনার বাণী ঠেলে উত্তাল ঝড় ওঠে কেন? সেই উত্তাল বুকটা আস্তে আস্তে নিরুত্তাপ হয়ে আসছিল, আবার আপন সন্তানরাই তাকে ধরে ধরে আছাড় মারছে।···

'মাতৃঋণ' শব্দটা তাহলে অর্থহীন? রক্তের ঋণই প্রবল প্রতাপান্বিত? তা নইলে তুষারকণার অনেক আশার আর অহঙ্কারের দুই ছেলে—

তারা কেন তুষারকণার সমস্ত সংগ্রাম ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের রক্তের ঋণ শুধতে বসলো?

কিম্বা তার চেয়েও নীচ আর নিকৃষ্ট হয়ে গেছে তার ছেলেরা। তারা পিতৃরক্তের ঋণ শুধতে বিলাসী হল, অমিতব্যয়ী হল, উচ্ছৃঙ্খল হল, কিন্তু যে লোভ আর স্বার্থপরতা আজ তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে

উঠছে, সেটা ওদের বাপের মধ্যে ছিল না। হয়ত সেইজন্যেই তুষার-কণা সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোও পার করে এসেছেন। কিন্তু তুষারকণার আপন গর্ভজাত সন্তান সেই নীচতার পঙ্ককুণ্ডে গা ডুবিয়েছে।

শুধু বড় মেজর থেকে অনেকটা ছোট ওই ছোটছেলেটা। সেইটুকুই তুষারকণার সারা জীবনের পুণ্যফল। মমতাভরা প্রাণ, স্বার্থবুদ্ধিহীন আর সদাউজ্জ্বল ওই ছেলে 'মা' বলে ডেকে কাছে এসে দাঁড়ালেই মন জুড়িয়ে যায়। ওর আকৃতিটাই শুধু প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় ও ওর সেই দাম্ভিক উর্ধ্বপুরুষ নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরীর একান্ত আত্মীয়জন, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। ও যেন কখনো সোনার ঝিনুকে দুধ খায়নি, রুপোর দোলনায় দোলেনি, মেম নার্সের হাতে মানুষ হয়নি।···যেন ঠাকুমা দিদিমার হাতে সেলাই করা নক্সি কাঁথায় শুয়ে মানুষ হয়েছে ও, দুধ খেয়েছে মায়ের বুকে মুখ রেখে, আর ঘুমিয়েছে বুড়ো ঝিয়ের কাছে রূপকথা শুনতে শুনতে।

ওকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ান যায় সেই বংশমদগর্বিত দাম্ভিক রাজাসাহেবের সামনে ওর অত্যন্ত অতি সাধারণ সাজে সাজিয়ে, কিন্তু মুখ কোথায়? যদি প্রশ্ন ঝিলিক দিয়ে ওঠে, 'তা' তো হল, মহৎ করে মানুষ করেছ ছেলেকে, সুন্দর আর সভ্য করে, কিন্তু তুষারকণা, তোমার আর দুই ছেলে? প্রথম আর দ্বিতীয়? তারা কোথায়? তারা কী করছে? তাদের আনলে না যে? খুব যে বড় মুখ করে বলে গিয়েছিলে, 'ওদের আমার নিজের হাতে নিলাম আমি।···আমার আদর্শে আর রুচিতে গড়ে তুলতে চাই ওদের···কী হল? কেমনটি গড়লে তাদের সেটা দেখাতে নিয়ে এলে না?'

এই ছোট ছেলেটা তো তখন নিতান্ত ছোট, জন্মাবধি রুগ্ন, বাঁচবে কি মরবে তাই বা কে জানে। সেই বড়মেজ দুটি নিয়েই হিসেব। যে হিসেবের খাতায় ফেল্ করেছে তুষারকণা।

কে জানে কেন এমন হল তারা!

বাপের অমিতাচার দেখে সচেতন না হয়ে ভেসে গেল তেমনি অমিতাচারের স্রোতে। আরো ক্ষুদ্র হল, মলিন হল।

তুষারকণা টের পান, ওরা আস্তে আস্তে ওদের দেশের বাড়ির চাকরবাকরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের পারিবারিক সঞ্চয়গুলি ধ্বংস করছে। বিলিতি কোম্পানির তৈরী বহু মূল্যবান সব ফার্ণিচার, দামী দামী কার্পেট, পর্দা, টী-সেট, ডিনার সেট, রুপোর বাসন, নীরেট রুপোর লম্বা লম্বা বাতিদান, ফুলদানি, সোনার জলে নাম লেখা চামড়ার বাঁধাই অমূল্য সব গ্রন্থ, মায় পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত সোনার বাঘমুখো, রূপোর ছড়ি, রূপোর গড়গড়া আলবোলা মদ্যপাত্র, সব সব, সব বার করে আনছে, জলের দরে বেচে দিচ্ছে, তার থেকে তো আবার ধাপে ধাপে 'কমিশন'ও আছে। তবু সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় লক্ষ্মীর ঝাঁপিতেও হাত বাড়াচ্ছে।

তুষারকণা নীরব দর্শকের মূর্তিতে তাকিয়ে দেখছেন।

প্রথম যখন ধরা পড়ে গিয়েছিল মায়ের চোখে, তখন বড়ছেলে অপ্রতিভ কৈফিয়ৎ দিয়েছিল, 'তোমার ওই শ্বশুরঠাকুরটি তো মরবে না মা, আমরাই আগে মরব, তবে আর 'আমাদের জিনিস' বলে সান্ত্বনা কোথায়?'

ক্রমশঃ বেপরোয়া মূর্তি ধরছে, উগ্র গলায় বলেছে। 'জিনিস-গুলো তো তোমার বাপ ঠাকুর্দার নয় বাপু, আমাদের বাপ ঠাকুর্দার, আমরা রাখি আর ফেলি তোমার কী?'

তুষারকণা চোখের জলটাকে আগুন করে ফেলে বলেছিলেন, 'কিন্তু তোমরা কেবল মাত্র তোমাদের বাপ ঠাকুর্দার নও, আমারও অংশ আছে, অন্ততঃ প্রাণপাত করে বড় করে তোলার মূল্যস্বরূপ। সেই তোমরা যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছ, সেটা সয় কী করে?'

ওরা যুক্তি খাড়া করে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, ওরা অন্যায্য কিছুই করছে না। বুড়ো মরার সঙ্গে সঙ্গে ওই চাকর-

বাকররাই সব বেহাত করে ফেলবে না ? তার মানে সব কিছু তারাই খাবে। এতো তবু বংশধরদেরই ভোগে লাগছে।'

'ভোগে লাগছে !'

তুষারকণা বিচিত্র একটু হাসি হেসে বলেছেন, 'ভাল ভোগেই লাগছে।'

এ ব্যঙ্গোক্তি গায়ে মেখে থাকে না ছেলে, সেও তেমনি একটু হেসে বলেছে—'এতে আর এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন মা ? এটা তো তোমার কাছে নতুন নয়।'

তুষারকণা হঠাৎ বুকে একটা চাপ অনুভব করেন, মনে হয় কোনখানে কোনো একটা যন্ত্র বুঝি ফেটে যাবে, তবু তুষারকণা অস্বীকার করতে পারেন না।

নতুন নয় ঠিকই, এটা তুষারকণার কাছে নতুন নয়। তুষারকণাও একদা ধনীর ঘরেই জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর সেই পিতৃকুলও তাদের অনেক বৈভব ঘুচিয়ে আজ নিঃস্ব, কেবলমাত্র নেশায় বিলাসিতায় আর অন্যায় ভোগে তাঁরা মরেছেন, এখন তুষারকণার ছোট ভাই একটা জুতোর দোকানে সেলস্‌ম্যানের কাজ করে।

তুষারকণার শ্বশুর ঠিক অমন নয় বটে, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর, বড় দাম্ভিক। মদের নেশা ছিল না তাঁর, কিন্তু যেটা ছিল সেটাও কম নয়। নেশা ছিল আত্মপ্রেমের।

সর্বদাই নিজেকে নিয়ে মগ্ন।

শুধু মহালক্ষ্মী সম্পর্কেই কিছুটা সজাগ সচেতন।

শাশুড়ী মহালক্ষ্মী।

ওই একটি মানুষ ছিলেন ও পরিবারে, যাঁকে স্মরণ করলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

সেই মানুষের শুভদৃষ্টি পড়লে হয়তো তুষারকণার ছেলেরা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হত। মাঝে মাঝে ভাবেন তুষারকণা, কিন্তু তাই কী ?

তাঁর নিজের সন্তানকে কি তিনি কল্যাণের দৃষ্টিতে দেখেন নি? তবে?

ভুল ভুল, সব নিয়তি।

যে যেমন হবার হবেই।

শিক্ষা-দীক্ষাটা পালিশ মাত্র, ভিতরটা যে যার নিজের প্রকৃতি নিয়ে আসে!

কিন্তু তখন তুষারকণা নিয়তিতে এত বিশ্বাসী ছিলেন না। তখন ভাবতেন, অন্যায় প্রশ্রয়, অন্যায় ঔদাসীন্য, আর অতিরিক্ত স্বাধীনতা, এই দিয়ে ছেলে নষ্ট করে ফেলেছেন ওঁরা।···আর তুষারকণা নামের এই পরমাসুন্দরী, মা বাপের পরম আদরিণী মেয়েটাকে নিয়ে এসে তার মাথায় নিজেদের ওই উচ্ছন্ন যাওয়া ছেলেটাকে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

তুষারকণা যে ওর কত অত্যাচারের সাক্ষী, কত অনাচারের দর্শক, ওঁরা তার কতটুকুই বা খবর রেখেছেন?

পুত্র পুত্রবধূর আলাদা মহল বানিয়ে দিয়ে রেখেছেন, আলাদা দাসদাসী দিয়েছেন, অপর্যাপ্ত হাতখরচ দিয়েছেন, ব্যস! মনে করেছেন এটাই যথেষ্ট ব্যবস্থা।

বাধা নেই, শাসন নেই, অদ্ভুত এক নিয়ম!

অথচ শাসন যখন করলেন, তখন একেবারে চরম দণ্ডই দিলেন নিখিলেন্দ্র নামক ব্যক্তিটি তাঁর একমাত্র পুত্রকে।

এ বংশের ধারাটাই নাকি এক পুত্রের। সাত পুরুষ থেকে হিসেব ধর, বোন এক আধটা থাকলেও কারো ভাই খুঁজে পাবে না। তুষারকণাই বংশে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। তুষারকণার দ্বিতীয় পুত্র

ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদে নিখিলেন্দ্র যেন বিচলিত হ'য়ে বলেছিলেন, আবার খোকা? বংশের ঐতিহ্যটা দেখছি নষ্ট হল! এরপর সম্পত্তি নিয়ে লাঠালাঠি হবে।

নিখিলেন্দ্র বংশের ঐতিহ্য ভাঙেন নি, অতএব তাঁর একটিই পুত্র। সেই পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন নিখিলেন্দ্র। বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

টনক নড়েনি আগে, টনক নড়েনি তখন, যখন তুষারকণার তুষারশুভ্র পিঠটা মাতালের চাবুকে চাবুকে কালসিটের নকসাকাটা হয়ে যেত। টনক নড়ল সেই দুর্ধর্ষ ছেলের একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবতী নার্সকে নিয়ে প্রত্যক্ষ উন্মত্ততার দৃশ্যে। মাতালের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ড।

কিন্তু নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরীর তো কাণ্ডজ্ঞান ছিল। তদ্দণ্ডে ছেলেকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। এবং ঘোষণা করে দিলেন ওই ছেলের জন্যে তাঁর আর কোন দায়দায়িত্ব রইল না, ওকে যদি কেউ ধার কর্জ দেয় নিজ দায়িত্বে দেবে। তারপর আইনসঙ্গতভাবে পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে পৌত্রদের বিষয়ের উত্তরাধিকারী করে দিলেন।

তখনো অবশ্য জানতেন না, নতুন গড়া একটি আইনের খোঁচায় সাতপুরুষের বিষয়সম্পত্তি সব কর্পূরের মত উপে যাবে। সব জমি জায়গা মৌজা তালুক লোপ পেয়ে যাবে। জানতেন না, তাই বড়মুখ করে নাতিদের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। অবশ্য নিজের জীবদ্দশা-কাল বাদ দিয়ে।

ছেলেকে শুধু কলকাতার ওই বড় বাড়িখানায় বাস করার অধিকার দিয়েছিলেন। যাতে ভঞ্জচৌধুরী বংশের ছেলে বস্তিতে গিয়ে বাস না করে।

কিন্তু পুত্রবধূকে তো তিনি পরম সমাদরে নিজের কাছে তার মার্বেল প্রাসাদে রাখতে চেয়েছিলেন। মাঝে মাঝেই সে কথাটা

ভাবেন তুষারকণা, যেন সেই দৃশ্যে ফিরে যান। ··দেখতে পান সিংহের মতন দৃপ্ত সেই পুরুষ, পঁয়ষট্টি বৎসরের পূর্ণযৌবনে দীপ্যমান, অপরাধীর মত এসে নম্রনত গলায় বলছেন, 'তোমার কাছে আমার মুখ দেখাবার মুখ নেই মা, যখনই ভাবছি সেই নোংরা নীচ জীবটা আমারই সন্তান তখন নিজেকে গুলি করে শেষ করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ইচ্ছের কথা থাক, মনে রেখো তোমার যাতে একবিন্দু অসুবিধে না হয় তার জন্যে সবাই হাজির থাকবে। জেনো, ভবিষ্যতে তুমিই এই রাজবাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী হবে, তোমার ছেলেরা হবে ভাবী উত্তরাধিকারী।'

বংশের ঐতিহ্যের মুখে চুনকালি দিয়ে তুষারকণা তখন তিন পুত্রের জননী হয়ে বসে আছেন। অত্যাচারী স্বামীর কাছে তো নিস্তার ছিল না।

ভাবলে এখনো কেঁপে ওঠেন তুষারকণা, সেই বিশালের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলেছিলেন তিনি।

বলেছিলেন, 'আমায় ক্ষমা করুন। এ বিষয় সম্পত্তি আমি আমার ছেলেদের জন্যে চাই না।

নিখিলেন্দ্র হয়ত ভেবেছিলেন, এটা তুষারকণার অভিমানের কথা, তাই ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, 'ওঃ আমার বলাটা ভুল হয়েছে। তোমার ছেলেরা নয়, বিষয়ের মালিক আমার নাতিরা। তুমি তাদের রক্ষয়িত্রী পালয়িত্রী।'

আশ্চর্য, কে তখন তুষারকণাকে অমন অপরিসীম শক্তি জুগিয়েছিল, কে জুগিয়েছিল মুখে অমন দুঃসাহসিক কথা?

নিখিলেন্দ্র সাহেবীআনার পূজারী, তাই ছেলের বৌয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ নিষেধের নীতি মানতেন না, কথা বলতেন। অগত্যা তুষারকণাও।

কিন্তু সে কোন কথা?

সে কি অমন নিষ্কম্প দীপশিখার মত দাঁড়িয়ে অমন ভয়ংকর কথা ? 'যেকোন কিছুকে নাম বদলে ডাকলেই সেটা অন্য হয় না বাবা ! ছেলেরা যে আমারও এতে তো কেউ না করতে পারবে না। আমি ওদের এই অশুচি বিষয় সম্পদ ভোগ করতে দেব না। আর এখানে থেকে আমি কোন শক্তিতে রক্ষা করব ওদের ? এ প্রাসাদের রক্তে মজ্জায় পাপ। এখানে মানুষ হলে ওরা এখানের মতই হবে। আমি তা হতে দেব না। আমি ওদের নিয়ে চলে যাব, গরীবের মতন করে মানুষ করব।

'চলে যাবে ?'

অসম্ভব উত্তেজিত দেখিয়েছিল নিখিলেন্দ্রনাথকে, 'ছেলেদের গরীবের মত করে মানুষ করবে ? সবই তোমার ইচ্ছাধীন ?'

কিন্তু তুষারকণা তখন অটল।

তুষারকণা অটল হয়েই বলেছিল, 'আমার ভাগ্যটাকে এবার আমার ইচ্ছের মতই চালাতে চাই বাবা !'

'চাইলেই হয় না। মনে রেখো ওরা আমার পৌত্র, এ বংশের বংশধর। ওদের এই বংশের মত করেই মানুষ করতে হবে।'

নিখিলেন্দ্রর টকটকে মুখটা যেন রক্তে ফেটে যেতে চাইছিল।

তবু কী দুর্বার দুঃসাহসে খাড়া ছিল তুষার নামের ফুলের মত মেয়েটা !

কে জুগিয়েছিল এই সাহস ?

কে জানে ? শুধু তুষারকণা নিজেই নিজের গলা শুনতে পেয়েছিলেন, 'এবংশের মত করে ? যে রকম একটি নমুনা আমায় দেখিয়েছেন ?'

তুষারকণা শুনতে পেয়েছিলেন সে সুরে ব্যঙ্গ রয়েছে।

ব্যস। মুহূর্তে সমস্ত পরিস্থিতির উপর যেন শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এসেছিল।

নিখিলেন্দ্র আর একটি কথাও বলেন নি। নিখিলেন্দ্র সেই ফেটেপড়া মুখটাকে লোকচক্ষু থেকে সামলাতে অকারণ খানিকটা পায়চারি করেছিলেন, তারপর চলে গিয়েছিলেন নিজের মহলে।

ঈশ্বর জানেন সেখানে কী করেছিলেন, কাকে কী বলেছিলেন।

তারপরই যশোদা এসে বলেছিলো, 'বাবা বলতে বলেছিলেন, বৌরাণী, আপনি কোথায় যাবেন, কখন যাবেন, কার সঙ্গে যাবেন, সেটা কাছারিঘরে জানিয়ে দেবেন, সেইমত ব্যবস্থা হবে। এরপর আর নড়চড় হবার উপায় নেই। তবে এইটুকু বলছি বৌরাণী, হাতের লক্ষ্মী হেলায় হারালেন। সবদিক ধ্বংস হল। আপনি খোকাদের নিয়ে এইখানে অচলা হয়ে থাকলে হয়ত কুমার রাজাবাবুরও মতিগতি ফিরত। দেখলেন তো, তেনাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছেন। তেনার বৌ ছেলেকে দিয়েছেন। রাগ ঝাল সবই তো ছেলেখেলা। আপনি সেটা বুঝলেন না।'

তুষারকণার তখন ওই দাসীটার কথা বিষ লেগেছিল, তুষারকণার সমস্ত অন্তরাত্মা তখন এই নরকপুরী থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে ছটফট করছিল।

সেই স্বামীর মতিগতি ফেরবার আশায় এইখানে বসে দিন গুণবেন তিনি? আর তাঁর ছেলেরা বংশের ধারা অনুসরণ করবার জন্যে প্রস্তুত হবে?

তার চেয়ে মরণ ভাল।

চলে এসেছিলেন।

নিখিলেন্দ্র দেখা করেন নি।

তুষারকণা আর দু-একদিনও থাকতে রাজী হননি, পরদিনই বেরিয়ে পড়েছিলেন। চলে এসেছিলেন প্রথমটা তাঁর মামাবাড়ি জলঢাকায়, তারপর মালদহে বাপের বাড়ি।...আর আস্তে আস্তে

এইখানে এই বাড়িতে। সেখানে যে তখনও বিজয়েন্দ্রনাথ রয়েছেন, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করছেন।

তিন তিনটে ছেলে নিয়ে দু-তিন জায়গায় বাস করতে করতে অনুভব করেছিলেন তুষারকণা, আগের সঙ্গে এখনের আদরযত্নের আকাশপাতাল পার্থক্য। তখন কোন একটা বিয়েটিয়ে উপলক্ষে এসেছেন, মামার বাড়ি, বাপের বাড়ি। দু-জায়গাতেই তুষারকণার ওই আসাটাই যেন উৎসবের সুর জাগিয়ে দিত···এখন অন্য সুর।

এখন অবিরত তুষারকণাকে দোষারোপের সুর।

'ভাল করনি', 'ঠিক করনি', 'উচিত হয়নি।'

একজনও বলল না, 'বেশ করেছ।'

তুষারকণা যদি তিন তিনটে ছেলে নিয়ে না ঘুরত, (যার একটা ছোট্ট হলেও দুটো বেশ ডাগর), যদি তার অনবদ্য রূপ যৌবন আর কর্মক্ষমতা নিয়ে স্বামীগৃহত্যাগিনী হত, হয়ত কেউ কেউ বলত, 'ঠিক করেছ, উচিত করেছ।'

কিন্তু তুষারকণা তো শুধু নিজে থাকতে চায় না, ছেলেদের লেখা-পড়ার জন্যে উদভ্রান্ত হচ্ছে। কে নেবে অত ঝামেলা?

তাহলে?

তাহলে তুমি স্বস্থানেই প্রস্থান কর। হয় তোমার শ্বশুরের কাছে যেখানে আরাম আছে আয়েস আছে, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি আছে, সর্বময়ী কর্ত্রীত্ব আছে এবং সর্বোপরি ছেলেদের ভবিষ্যৎ আছে। ভবিষ্যৎ?

কিন্তু সেইখানেই তো সন্দেহ।

তাছাড়া সেখানের পথে নিজের হাতে কাঁটা দিয়ে এসেছে তুষারকণা নামের অপরিণামদর্শী মেয়েটা। শাশুড়ী তো কবেই খতম হয়েছেন। শ্বশুরই কি চিরকালের? তুষারকণা তো নাবালকের অভিভাবক হয়ে সুখে রাজ্যপাট করতে পারত।

বেশ, সে পথে যদি কাঁটা থাকে তো শেষ আশ্রয় স্বামীর ঘরে যাও। বিধবা তো নও, জলজ্যান্ত একটা স্বামী তো আছে, আর তার একটা মস্ত বাড়িও আছে (যার উপর তার দান বিক্রয়ের অধিকার না থাকলেও বাসের অধিকার আছে। বিক্রীর অধিকার নেই বলেই তো এখনো আছে।) সেখানে গিয়ে ওঠ।

স্বামী দুশ্চরিত্র? মাতাল? অত্যাচারী?

নতুন কিছু নয়।

লক্ষ্মীর ঘরেই তো অলক্ষ্মীর উপদ্রব—সে তো অনবরতই তার প্রতিপক্ষকে হঠাবার চেষ্টায় ইঁদুরের মত গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে মাটি তোলে। যাতে লক্ষ্মীর ভিৎ নড়ে ওঠে।

অলক্ষ্মীর দাপটে লক্ষ্মী অবশেষে বিদায় মাগেন।

এসব তো চিরকালের ইতিহাস, জানা ইতিহাস।

অতএব স্বামীর ওই দোষগুলো ধরতে গেলে চলবে না। ধনীর ঘরে এসে ঢুকেছিলে কেন তাহলে?

প্রশ্নবাণাহত আর নিরুপায় তুষারকণাকে শেষ পর্যন্ত এইখানে, এই বাড়িতে এসে উঠতে হয়েছিল।

কিন্তু কোথায় সেই ওঠা?

নরকে?

যদিও একমাত্র বিজয়েন্দ্রই বলেছিলেন, 'বেশ করেছ ঠিক করেছ, কর্তার নাকের ওপর নাগরা ছুঁড়ে মেরে এসেছ, ব্রেভো!'

কিন্তু মাতালের জড়িত কণ্ঠের সেই উৎসাহ বাণীর মূল্য কী?

তার পরের দিনগুলো?

উঃ কী দুঃসহ! কী ক্লেদাক্ত! কী নির্লজ্জ নিরাবরণ!

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর কাছে আশ্রয় নিতে যাবার ইচ্ছে দুরন্ত হয়ে

উঠেছে, শুধু দাঁতে দাঁত দিয়ে কাটিয়েছেন ছেলেদের 'মানুষ' করে তুলবেন এই আশায়।

সেই 'মানুষ' হয়ে ওঠা ছেলেদের নিয়ে জগতকে দেখাবেন, 'দেখো তুষারকণা তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছে কি না।'

সে আশ্বাস তো দিচ্ছিলও তারা।

লেখাপড়ায় প্রত্যাশার অতীতই হচ্ছিল।

আস্তে আস্তে তার পিছু পিছু জন্ম-রুগ্ন ছোট ছেলেটা! সে আর রুগ্নও থাকছিল না। কিন্তু কেমন করে যেন ওরা বদলাতে শুরু করল।

দুই ছেলে যখন সবে স্কুলের গণ্ডি কাটাল সেই সময় বিজয়েন্দ্র মারা গেলেন।

তার মানে বিধবা হলেন তুষারকণা।

কিন্তু তুষারকণা কি সেই বৈধব্যকে দুর্ভাগ্য বলে ধরেছিলেন? না! তুষারকণা হিন্দু নারীর সমস্ত ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে মনে মনে বলে উঠেছিলেন, 'আঃ কী মুক্তি! কী মুক্তি! পৃথিবীতে কত আলো, কত বাতাস!'

তুষারকণার সমগ্র চেতনা সেই মুক্তির স্বাদে বিবশ হয়ে অবিরত বসে বসে স্বপ্নের জাল রচনা করেছিল।

সেই জালটা ছিঁড়ে গেছে।

তুষারকণার ছেলেরা ভঞ্জচৌধুরী বংশের রক্তের ঋণ শোধ করছে।

এর পরে আর তুষারকণার জীবনে 'মুক্তি' আসবে কোন পথে?

একটিই মাত্র পথ, স্বয়ং যোদ্ধারই মৃত্যু।

সান্ত্বনা কোন কাজে লাগে না।

'অনিবার্য নিয়তি' একটা অর্থহীন শব্দের পাথর হয়ে বসে থাকে।

যখনি একা হন তুষারকণা, ওই ছেঁড়া জালটার দিকে তাকিয়ে

দেখেন। আর সেই ছেঁড়া ফুটোর মধ্য দিয়ে অনবরত তুষারকণার অতীত আর ভবিষ্যৎ যাতায়াত করে। বোঝা যায় না কে কোনটা।

কিন্তু আশ্চর্য, এই রকম সময়েই তুষারকণা আবার জালই বোনেন। অপ্রত্যক্ষে নয়, প্রত্যক্ষে।...সস্তার মোটা মোটা পশম নিয়ে দুটো কাঠির সাহায্যে বুনে তোলেন ছোট ছোট সোয়েটার মোজা, টুপি। আশপাশের গরীব ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।...মনুজ বলে, 'এত কাজের মধ্যে আবার এত খাটো কেন?'

তুষারকণা তাঁর ছোট ছেলের বিরক্তি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'অবিরত হাত দুটো না চালালে ঠিক পাগল হয়ে যেতাম মনু! তাই হয় কাজ, নয় অকাজ নিয়েই বসি।'

তবু এখন ঘরে ঢুকেই মনু বলে উঠল, 'আবার সেই উল, সেই কাঠি? নমস্কার মা, তোমার চরণে কোটি প্রণাম।'

তুষারকণার চেহারা এখন জলন্ত আগুনের ভস্মাবশেষ। তবু এই ছেলেটা যেই এসে হুড়মুড়িয়ে ঢোকে, সেই ভস্মে আলোর আভা ফুটে ওঠে।

সেই আভার ছাপ নিয়ে তুষারকণা বলেন, 'আমার চরণে প্রণাম করবি, এ আর বেশী কথা কি? যাকগে, এই রাখলাম সরিয়ে। আজ এত দেরী যে?'

'দেরী? কারণ কিছু না, এমনি। আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। কান মুলে দেবে না?'

'কান মুলবার মতন হলে নিশ্চয় মুলব।'

'তবে আগেই না হয় মুলে নাও।' বলে মনুজ মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

এই ওর স্বভাব।

তুষারকণার এতে চোখে জলই এসে যায়। আবার মাঝে

মাঝে সন্দেহও হয়, মনে হয় 'আমি দুঃখিনী বলে ও কি আমায় করুণা করছে ?'

এখনও তা মনে হল।

ছেলের চুলের ওপর একটা হাত রেখে চুপ করে বসে থাকলেন। ছেলেও চোখ মুদে চুপ। হঠাৎ এক সময় বলে ওঠে, 'আচ্ছা মা, তোমার সেই শ্বশুরবাড়িতে রাজামশাই শ্বশুরটি ছাড়া আর কেউ আছে ? মানে পুরুষমানুষ ?'

তুষারকণা আশ্চর্য হন।

হঠাৎ ওর মুখে এ প্রশ্ন কেন ?

বললেন, 'আমার শ্বশুরবাড়ি ? সেটা আবার কোন কবর থেকে তুলে আনলি ?'

'মাঝে মাঝেই তার উঠে আসার ছায়া তো দেখি' মনুজ উঠে বসে বলে, 'দাদারা যা করছে, খুব খারাপ। বিশ্রী লাগে।'

তুষারকণা একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'ওরা এরকম হবে কে ভেবেছিল। আমার তো শ্বশুরবাড়ি বলে কিছু মায়ামমতা নেই, তবু এইভাবে তার সমস্ত শোভা-সৌন্দর্য শেষ করে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলা, ভাবা যায় না।···একদিন দেখি তোর বড়দার ঘরে ড্রয়ারে একটা পাউডার কেস রয়েছে রুপোর ওপর মিনে করা, ঢাকনির মুণ্ডিটা সোনার দেখে চিনতে পারলাম জিনিসটা আমার শাশুড়ীর নিত্য ব্যবহারের ছিল। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল, অনেকবার ভাবলাম বলি—'অম্বু ওটা বেচে দিসনে, ওটা তোর বৌয়ের জন্যে রেখে দে—' বললাম না। বলে কী হবে ? কথা কি রাখবে ?'

মনুজ বিছানা থেকে একটা ছোট বালিশ তুলে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে বলে, 'বুড়ো লোকটা একা থাকে—'

'ভাগ্য তাঁর !'

'তা বটে। কিন্তু সত্যিই কি আর কেউ নেই? আমার কাকা জ্যাঠা গোছের?'

তুষারকণা হেসে ফেলে বলেন, 'তুই যে অবাক করলি মনু! কাকা জ্যাঠা কোথা থেকে আসবে? শুনিসনি ওঁদের ওই বংশটি একছেলের বংশ। সাত পুরুষ ধরে চলে আসছে!'

মনুজও হেসে উঠে বলে, 'আমরাই তাহলে নিয়মের ব্যতিক্রম?'

তুষারকণা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কী দেখেন, কী পড়েন কে জানে, আস্তে বলেন, 'সেই তো! সেইজন্যেই বোধহয় তোদের রাজা হওয়া হল না।'

মনুজ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'সেজন্যে তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ভাবছি···আচ্ছা মা, কারুর কি মেয়েটেয়ে ছিল না? মানে ভাগ্নেটাগ্নে এমন কেউ থাকতে পারে যার সঙ্গে আমার চেহারার মিল থাকা সম্ভব?'

তুষারকণা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'কী তোর মতলব বল তো? কার কাছে কী শুনেছিস? 'ঝিন্দের বন্দী' হতে চাস না কি?'

মনুজ হেসে ওঠে হা হা করে, উদাত্ত প্রবল। এ হাসি মনুজের স্বভাবগত। মনুজের দাঁত বাঁধানো নয়। তবু শিপ্রা নামের মেয়েটা একটা বাঁধানো দাঁতের হাসি দেখে তার সঙ্গে মনুজের হাসির সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল।

তুষারকণাও পান, মনুজ এ রকম হেসে উঠলেই তুষারকণার তাঁর সেই রাজাসাহেব শ্বশুরের হাসিটা মনে পড়ে যায়।···

সর্বদা হাসতেন না, কখনো কখনো ঝলসে উঠত সে হাসি।

তুষারকণা সেই মানুষটিকে কখনো অশ্রদ্ধা করতেন না। বরং খুব শ্রদ্ধা আর সমীহ করতেন, ভালও বাসতেন, তবু তাঁকেই ভয়ংকর একটা আঘাত হেনে চলে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে এক

দিন সেই আঘাতকে ঈশ্বরের 'আশীর্বাদ স্বরূপ' করে তুলে কাছে গিয়ে নম্রনত মুখে দাঁড়াতে পারবেন। হ'ল না।

মনুজ বলে, 'কার্যকরণ সম্পর্কে তোমার যেমন অনুসন্ধিৎসা মা, ডিটেকটিভ হতে পারতে তুমি। ভয় নেই, ঝিন্দের বন্দী হতে যাচ্ছি না কোথাও! এমনি মনে হল!'

তুষারকণা বললেন, 'খুব বেশী মিল আছে তোর সেই রাজাসাহেব ঠাকুর্দার সঙ্গে। যত তুই বড় হচ্ছিস, ততই ধরা পড়ছে। হাঁটা চলা, কথা বলার ভঙ্গী, আর সব থেকে হচ্ছে হাসিটা। এক এক সময় চমকে যাই। তুই অবিকল তোর ঠাকুর্দার মত দেখতে।

মনুজের যা জানবার তার কিছুটা তো জানা হল, কিন্তু খটকা ঘুচল কই?

এ প্রসঙ্গে আর এগোবার কিছু নেই। মনুজ কথায় দাঁড়ি টানতে বলে ওঠে, 'দেখে শ্বশুর বলে ভ্রম হয়?'

তুষারকণা রাগ দেখিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ হয় ভ্রম!' তারপর হেসে ফেলে বলেন, 'তা তুই যদি তাঁর মত রাজবেশ পরতিস ভ্রম হওয়া আশ্চর্য হত না। তবে তুই তো আমার ঘুঁটেকুড়ুনি মায়ের রাখাল ছেলে! তোর সঙ্গে আর মিল হবে কোথা থেকে?...হ্যাঁরে, কেউ বুঝি তোকে বলেছে এ কথা?'

মনুজ চকিত হয়ে বলে, 'কী কথা?'

'এই তোর ঠাকুর্দার মত দেখতে তুই!'

মনুজ একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'কে আবার বলতে যাবে? এমনি মনে হচ্ছিল। তবে বাহাদুর বলতে হবে বুড়োকে একবারের জন্যে মান খুইয়ে তোমায় ডাকলও না তো!'

তুষারকণা বিমনা হয়ে বলেন, 'আমিই বা কবে যেতে পারলাম বল? আমি তো ছোট, আমারই তো হেঁট হওয়া উচিত ছিল?'

মনুজ উঠে পড়ে বলে, 'হেঁট হওয়া কারুরই উচিত নয় মা! ছোটরও না। ...তবে দাদারা যা করছে—'

আর এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।

জানা হয়ে গিয়েছে নিখিলেন্দ ভঞ্জচৌধুরী একাই থাকেন। হয়ত কায়াকল্পটল্প কিছু করে থাকবেন। বলব গিয়ে শিপ্রাকে।

জ্ঞানে না দেখা সেই লোকটার জন্যে হঠাৎ মন কেমন করে উঠল মনুজের, আহা বিরাশী তিরাশী বছরের একটা বুড়োমানুষ, চাকর-টাকর ছাড়া আর কেউ থাকে না তার কাছে, কোথাও নেই একটু মমতার স্পর্শ, একটু ভালবাসার স্বাদ। কারুর জন্যে কিছু করবার নেই ওঁর, ওঁর জন্যে কারুর। অথচ উনি আমাদের সবচেয়ে নিকটজন। ...আমাদের পরিচয়।

কিন্তু সত্যিই কি একেবারে একা থাকেন নিখিলেন্দ্র?

কারুর জন্যে কিছু করবার নেই তাঁর? তাঁর জন্যে কারুর?

একটি পূজা প্রীতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় ভরা হৃদয় কি নম্র প্রণাম নিয়ে বসে থাকে না, কেবলমাত্র তাঁর জন্যেই?

থাকে। সেইটুকুই তার জীবন।

আলোর জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন সেই প্রাণীটার কাছে নিখিলেন্দ্রনাথই আলো, নিখিলেন্দ্রনাথই জগৎ।

আর নিখিলেন্দ্রর কাছে?

আত্মপ্রেমী নিখিলেন্দ্রর মনের দেয়ালে ওই একটুখানিই ফোকর, এক চিলতে জানলা।

নিজে কোনদিন মরবেন, একথা একবারও ভাবেন না নিখিলেন্দ্র, তবু মাঝে মাঝে ওর জন্যে ভাবেন। ভাবেন আমি মরলে ওর কী হবে? যদিও নিখিলেন্দ্রর জীবনে ওর জায়গা সামান্যই, ও ওর উপস্থিতি দিয়ে ব্যস্ত করতে আসে না নিখিলেন্দ্রকে, শুধু যখন তিনি স্বেচ্ছায় ডাকেন, খোঁজ করেন, তখনই এসে বসে।

এই ডাকটির জন্যেই তার সমগ্র হৃদয় উন্মুখ হয়ে থাকে। এই ডাকটিই তার দিন রাত্রি সকাল সন্ধ্যা।

কিন্তু ওর কি 'দিন রাত্রি' আছে? আছে 'সকাল সন্ধ্যা'?...

নিখিলেন্দ্র যখন দরজার কাছ থেকে বলেন, 'নিরু উঠেছিস?'

ও তখন বুঝতে পারে সকাল হয়ে গেছে। যখন শুনতে পায় যশোদাকে ডেকে জিগ্যেস কর্ছেন, 'নিরুর খাওয়া হয়েছে?' তখন বুঝতে পারে দুপুর হল নিখিলেন্দ্র এবার খেতে বসবেন।

আবার যখন যশোদা এসে ডাকে 'নিরুদি, বারান্দায় চল, এবার খবর হবে' তখন টের পায় সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে।

আর রাত্তির হওয়া বুঝতে পারে ওই চিরপরিচিত অভিজাত মসৃণ কণ্ঠের সস্নেহ নির্দেশ' 'নিরু এবার শুয়ে পড়।'

সকাল সন্ধ্যে রেডিওর খবর শোনাটা নিখিলেন্দ্রর চন্দ্রসূর্যের মতই নিয়মে বাঁধা, সকালেরটা শোনেন তেল মাখতে মাখতে তখন নিরুপমাকে ডাকা যায় না। নিরুপমার দৃষ্টি নেই, কিন্তু নিখিলেন্দ্রর তা আছে?

সন্ধ্যের টাইমে নিরুপমা এসে বসে কাছ ঘেঁসেটেসে নয়, শুধু কাছাকাছি কোনও আসনে।—এটা পারিবারিক সম্ভ্রমবোধের নিয়ম।

একাই আসতে পারে ওর ঘর থেকে—এই বারান্দার প্রতিটি ইঞ্চি তার মুখস্থ, তবু যশোদা ধরে ধরে নিয়ে আসে' বসিয়ে দেয় একটা আসনে।

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'আয় বোস। শোন আজ আবার কী নতুন খবর দেয়।'...

আবার আপনিই হেসে উঠে বলেন, 'রোজ রোজ আর নতুন খবর পাবে কোথা থেকে? এবেলা ওবেলা চারবেলা খবর। পুরনো কথাই নতুন করে সাজিয়ে বলে।'

নিরুপমা একটু হাসে মাত্র।

নয়ত বড়জোর বলে ফেলে, 'কারুর পরলোকগমনের খবরটাই যা নতুন।'

নিখিলেন্দ্র হাহা করে হেসে ওঠেন, 'ঠিক বলেছিস। মরাটাই যা একটা নতুন খবর। কিন্তু রাম শ্যাম যদু মধুর তো নয়, তারা তো রাতদিনই মরছে। কী বলিস?'

নিরু হয়ত আবারও একটু হাসে।

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'বলদিকি, আমি মরে গেলে বলবে রেডিওয়?'

নিরু বলে ওঠে, 'মামা, আবার?'

অর্থাৎ আবার মরার কথা।

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'আরে বাবা, এখুনি কি মরছি? তা কোন একদিন তো মরতে হবে! সে খবরটা দেশের সর্বত্র পৌঁছবে বলে মনে হয় তোর?'

নিরু মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আমি জানি না।'

এটা রাগের কথা।

নিখিলেন্দ্র এ রাগ উপভোগ করে—বলেন, 'আচ্ছা আমিই বলি। আমি জানি কেউ—জানবে না। কেন জানতে যাবে? এই দেশ, এই সমাজ, এই পৃথিবী, এদের জন্যে কখনো কিছু করেছি আমি?···আমি শুধু নিয়েছি, নিয়ে চলেছি দিইনি তো কাউকে কিছু। আমার বাঁচা মরায় কী এসে যায় দেশের, সমাজের, সংসারের?···'

এ সময় একটু বেশী কথা বলেন নিখিলেন্দ্র, বলে ফেলেন। তার 'কারণ' হচ্ছে অবশ্য এ সময় পাকস্থলীতে কিছু রঙিন বস্তু পড়ে। পরিমিত, প্রয়োজন মত। প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটু কথা বলেন।

নিরুপমা তো ওতেই কৃতার্থ।

শব্দের মধ্য দিয়েই তো তার জগৎকে পাওয়া!

খবর শেষ হয়ে যাবার পর দু'চারটি কথা, দুএকবার হাহা করে হেসে ওঠা, হয়ত বলা, 'নিরু, ওষুধ খেয়েছিস? এখন আর তোর

মাথায় বেশী যন্ত্রণা হয় ? অসুবিধে কিছু হলে যশোদাকে বলিস।'... এই কুশল প্রশ্নগুলো যে সুখশেষের সঙ্কেত, তা অনুভব করতে পারে নিরুপমা।

যেন খবর হতে হতে 'খেলার খবর' শুরু হওয়া। ওটাই শেষের সঙ্কেত। জানা হয়ে গেছে ওর পর নতুন আর কিছু দেবে না ওই আকাশবাণী।

ওইগুলোর উত্তর দেওয়া হলেই, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় নিরুপমা। নিখিলেন্দ্র ডাকেন, 'যশোদা!'

আগে অনেকদিন আগে প্রথম যখন এসেছিল নিরুপমা এখানে, তখন বলত, 'মামা যখন খেতে বসবেন, আমায় নিয়ে যেও যশোদাদি! আমি কাছে বসে থাকব।'

নিখিলেন্দ্র এ প্রস্তাব শুনে গম্ভীর হাস্যে বলেছেন, 'কাছে বসে থেকে কী হবে ? আমার সঙ্গে টেবিলে বসতে রাজী আছিস ?'

নিরুপমা তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটো বোধকরি অভ্যাসের বশেই তুলে বলেছে, 'আহা!'

এছাড়া আর কি বলবে বিধবা নিরুপমা ?

নিখিলেন্দ্র তেমনি গম্ভীর হাস্যে বলেছেন, 'তবে হল না। একজন ক্ষুধার্তের সামনে বসে চব্যচোষ্য চালানো যাবে না।'

'বেশ, আমি না হয় আগেই খেয়ে নিয়ে আসব।'

'কী খেয়ে ? সেই কাঁচকলার পিণ্ডি তো ?'

দুঃখের সমুদ্র থেকে উঠে এসে ডাঙা পাওয়া নিরুপমার এই মমতার স্পর্শে চোখে জল এসে যেত, তবু জোর করে গলা হালকা করে বলত, 'কাঁচকলা কেন ? কত ভাল ভাল রান্না তো খাই!'

'ওসবকে আমি ভাল বলি না। তুই মামাকে ভক্তি করতে কাছে বসে খাওয়াতে আসবি, মামার গলা দিয়ে খাবারদাবার নামবেই না। মাছের মুড়োর কাঁটা টাকরায় বিঁধবে।'

অতএব মামার খাওয়ার কাছে এসে বসা হয়নি নিরুপমার, হয় না। চায়ের সময়ও না। তার যা কিছু খাওয়া নিজের ঘরে বসে। ...এও কোনদিন বলেন না নিখিলেন্দ্র, বৈধব্যের আচারটাচারগুলো অত নিখুঁত পালন করার তোর দরকার কী?'...

নিয়মকে শ্রদ্ধা করেন নিখিলেন্দ্র।

নিরুপমাকে দেখলে অবশ্য যতটা 'বিধবা' মনে হয়, তার চাইতে বেশী মনে হয় কুমারী। নিরুপমার পরনে অধিকাংশ সময়েই সাদা শাড়ি হলেও মিহি খোলের ভাল পাড়ের কখনো কখনো অতি হালকা রঙের সিল্কটিল্ক, পাড় ছাড়া, হালকা পাড়। গায়ে হালকা রঙেরই ব্লাউজ। তাছাড়া ওর মুখে এখনো যেন কিশোরীর লাবণ্য।

যশোদা যখন ওর জামা কাপড় হাতে এগিয়ে দেয়, ও আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'এটা কী শাড়ি যশোদাদি? রঙিন?'

যশোদা বলে, 'রঙিন আবার কোথা? শাদাই তো।'

নিরুপমা আর কিছু বলে না।

যশোদা ওকে টুলে বসিয়ে, চুল বেঁধে দেয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নিরুপমা বলে, 'থাক না যশোদাদি, আমি নিজেই পারব, তুমি বুড়ো মানুষ!'

যশোদা ছাড়ে না।

বলে, 'তোমার মায়ের চুল বরাবর বেঁধেছি নিরুদি! আমার হাতে ছাড়া পছন্দই হত না।'

'বাঃ আমি বুঝি পছন্দ না হওয়ার কথা বলছি?'

যশোদা বলে, 'তুমি যা বলছ, তা আমি বুঝেছি গো! এ বাড়িতে জীবন কাটল, আর কিছু শিখি না শিখি কথা বুঝতে শিখেছি। বলা কথা, না বলা কথা, সব বুঝি!'

কোন কোন দিন চুপ করে যায় নিরু, কোন কোন দিন বলে, 'তোমাকে আমার হিংসে হয় যশোদাদি!'

যশোদা কপালে হাত চাপড়ায়, 'আ আমার পোড়া কপাল, আমাকে হিংসে।'

নিরুপমা খোলা চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলে, 'তুমি আমার মাকে কত বছর ধরে দেখেছ, আর আমি? মোটে তিনটি বছর। জ্ঞানও হয়নি।'

যশোদা গভীর পরিতাপের নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তা যা বলেছ। একটা 'ছেলে ছেলে' করে পাগল তা' বাঁজা তো ছিল না। গাছে ফল ধরতে কসুর ছিল না। হয়, রয় না। কত ডাক্তার বদ্যি কত মাদুলী কবচ। শেষে এক সাহেব ডাক্তার এল। তো জামাই রাজাকে ধরে কী ভূতো ভবিষ্যতি! বলে তোমার দোষেই মেয়েটার এই দুর্গতি। জামাই রাজা তো সেই রাগে পরিবারকে দু'বছর আর ঘরেই নিয়ে যায় না, অবশেষে কী সুমতি হল, এসে তোয়াজ করে নিয়ে গেল। আহা, তারপর সেই তুমি হলে, কিন্তু ভোগ হল না।'

নিরুপমা তার কাঁচের চোখের মত নিষ্পলক দুই চোখ মেলে চুপ করে বসে থাকে। নিরুপমার ওই বিষণ্ণ মুখটা দেখলে বড় দুঃখ লাগে।

বুড়ি যশোদা ভয় খায়, কথা সামলে নেয়। কর্তাবাবার বারণ আছে 'পুরনো কথা তুলো না ওর কাছে।'

কিন্তু যশোদার কথার ভাঁড়ারে পুরনো কথা ছাড়া আর কোন্ কথা আছে? নতুন কথা কোথায় পাবে যশোদা?···কথা কইতে গেলেই পুরনো কথা উথলে উঠে আসে।

কত দেখল যশোদা, কত শুনল।

কত আলো, কত আগুন!

এখন কবরের শান্তি। কিন্তু সেইসব জমকালো দিনের কথাগুলো এক আধবার না বলতে পারলে বাঁচে মানুষ?

বুড়ি তার সাধ্যমত নিরুপমার সেই বিরাট চুলের বোঝা আঁচড়ে আঁচড়ে দুদিকে দুটো বিনুনি ঝুলিয়ে দেয়।

(অত চুল সামলে খোঁপা বাঁধতে পারে না) তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে হাতে হাতে একটি একটি করে তুলে দেয়, প্রসাধনদ্রব্যের শিশি কৌটোগুলি মুখ খুলে খুলে।

নিরুপমার এসবে আপত্তি ছিল, কিন্তু তার আপত্তি গ্রাহ্য হয়নি। যশোদা রায় দিয়েছিল, 'তোমাকে অপরিপাটি দেখলে বাবা কুরুক্ষেত্তর করবে।'

'কুরুক্ষেত্র' কোন কিছুতেই করেন না নিখিলেন্দ্র, ওটা যশোদার মুদ্রাদোষ। নিখিলেন্দ্র একটু গম্ভীর হয়ে গেলেই, ওর কাছে কুরুক্ষেত্তর সামিল

সাজসজ্জা হয়ে গেলে নিরুপমা কিছু না কিছু বোনা নিয়ে বসে। দৃষ্টিহীন চোখ, তবু পশমে প্যাটার্ণ তুলে তুলে নিখিলেন্দ্রের জন্যে গায়ের চাদর বানায়, সোফার ঢাকা বানায়, টী-কোজি বানায়।

নিখিলেন্দ্রের জন্যে কিছু করবার জন্যে 'কেউ' আছে তাহলে!

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'কেন এত কষ্ট করিস নিরু? কতই তো আছে।'

নিরুপমা বিষণ্ণ হাসি হাসে, 'কিন্তু আমার যে আর কিছু করার নেই মামা।'

জন্মান্ধ নয়, আস্তে আস্তে দৃষ্টি ক্ষীণ হতে হতে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

পৃথিবীর শেষ রংটুকুও যখন মুছে গেল, তখন নিরুপমার বয়েস আঠারো। ...শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীতা, ওদের অভিযোগ ঠকিয়ে অন্ধ মেয়ের বিয়ে দিয়েছে।...আর ডাক্তারী চিকিৎসায় প্রমাণিত, এ ব্যাধির মূলটা কুৎসিত অশুচি। নিরুপমার পিতৃরক্ত নোংরা ব্যাধি-বীজে বিষাক্ত।...এ তার জের।

এ বৌকে কে পূজ্যি করবে?

বড়লোকের বাড়ি বলে খেতে দেয়, বাসন মাজায় না গেরস্তঘরের

হলে তাও করত। আর মা বাপ থাকলে, বাপের বাড়ি বিদেয় করে দিত।

তলে তলে ছেলের আর একটা বিয়ের চেষ্টা চালাচ্ছিল, হঠাৎ লোকটা মারাই গেল।

অথচ ঠিক তার আগেই উকিলের পরামর্শ নিচ্ছিল—স্ত্রী অন্ধ হলে, পুনবার বিবাহে আইনের বাধা আছে কিনা?

নতুন একটা বিয়ের আশায় মসগুল হচ্ছিল, হঠাৎ হার্টটা ফেল করবার কি ছিল তার?

এরপর আবার কোন শ্বশুরবাড়ি সেই বৌকে বাড়িতে রাখে? অনেক টাকা থাকলেই যে মনটা অনেক বড় হয় এমন তো নয়?

বাপ নেই মা নেই, অন্ধ বিধবা, এমন মেয়েকে জায়গা দেবার জন্যে আগ্রহের হাত বাড়াবে এমন লোক জগতে বেশী থাকে না।

নিখিলেন্দ্র সেই কমেদের একজন।

নিখিলেন্দ্র পরম সমাদরে নিয়ে এলেন মা-বাপ মরা ভাগ্নীকে। সেও আজ আঠারো বছর হয়ে গেল।

কিন্তু ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি, আজো নিরুপমা নামের মেয়েটা তেমনি সমাদ্রিতা। একদিনের জন্যে নিজেকে অসহায় ভাববার ফাঁক পায় না মেয়েটা।

মামার কাছে এসে বসবার আর একটি সময় নির্দিষ্ট আছে নিরুপমার। রাত্রে খাওয়ার পর। 'পশ্চিমের বারান্দার টাইমে।'

এখানে আরামচেয়ার নয়, একটা পালঙ্কসদৃশ রাজকীয় ডিভ্যান আছে, এখন শীতের সময় কাশ্মীরী পশমের গালচে পাতা। বারান্দার বড় বড় জানলাগুলোর শার্সির পাল্লা বন্ধ করা আছে, কাঁচের মধ্যে থেকে বাইরেটাকে শুধু একটা জমাটবাঁধা অন্ধকারের পাহাড়ের মত ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

গরমকালে জানলার পাল্লাগুলো হা করা থাকে, ঝোড়ো হাওয়া

বয়, বাইরের অন্ধকারটা ফিকে লাগে। জ্যোৎস্না রাত্তি হলে বোঝা যায় অন্ধকারের মধ্যে ভাব আছে।

অনেকখানিটা রুক্ষ ধূসর প্রান্তরের ওপারে গাঢ় সবুজ ঘন অরণ্যানি। এ অরণ্য বহু দূর বিস্তৃত হয়ে পাহাড়ের কোলে গিয়ে ঠেকেছে। ওই বনভূমি অনেকখানিটা অংশ ছিল ভঞ্জচৌধুরীদের অধিকৃত।···যৌবনে কত কত দিন ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে গেছেন, শিকার করতে নিয়ে গেছে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবকে, পুলিশসাহেবকে উদ্দেশ্য তাঁদের একটু প্লীজ করা।

সে উদ্দেশ্যের উদ্যোক্তা ছিলেন অবশ্য নিখিলেন্দ্রের বাবা, তবে সঙ্গী হিসেবে ছেলেকে পাঠানোই সঙ্গত মনে করেছেন। ছেলেও তো শিকারপাগল। শিকার করতে গেছেন নিখিলেন্দ্র ওই ঘন অরণ্যের গভীরে।

সেই সব জায়গা থেকে শিকার করে এনেছেন নিখিলেন্দ্র বনবরা, জাগুয়ার, চিতা, পাহাড়ী মোষ।

নিখিলেন্দ্রের মাথার পিছনের দেওয়ালে উঁচুতে যে আস্ত বাঘছালটা টাঙ্গানো আছে তার গম্ভীর ভয়াবহ মুখ নিয়ে, সেই বাঘটার জন্মভূমি ছিল, ওই অরণ্য। ওকে শেষ করতে গিয়ে নিজের জীবনটাই প্রায় শেষ হতে বসেছিল নিখিলেন্দ্রর।

তবু শিকারের নেশা অব্যাহত ছিল।

একবার শিকার করতে বেরিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন ভুটান বর্ডারের ওদিকে এক গভীর জঙ্গলে, সেখানে একবার এক বৃহৎ বাঘ মারলেন, যাকে বলে একেবারে জাতবাঘ।

গাঢ় হলুদ রঙের উপর ঘন ব্রাউন রংয়ের ডোরা, সেই বাঘটার মৃত্যু মুখটার ছবি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি নিখিলেন্দ্র। তার মুখের সেই ব্যঞ্জনায় যেন যন্ত্রণা ছিল না, রোষ ছিল না, কাতরতা ছিল না, ছিল ধিক্কার।···অন্তত দেখে তাই মনে হয়েছিল

নিখিলেন্দ্রনাথের। ও যেন সমস্ত মনুষ্যসমাজকে ধিক্কার দিয়ে গেল।

তার সেই ভীষণ সুন্দর ছালটা সঙ্গী ইংরেজটিকে উপহার দিয়েছিলেন।

ওই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন কোথায় হারিয়ে যায়, কুমার নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরীকে দেখতে পান নিখিলেন্দ্র।·· সে লোকটা কে? শিকারের পিছনে উর্ধ্বশ্বাস গতিতে ধাবমান, কী উন্মাদনা! কী রোমাঞ্চ!

এখন আর ওই বনসম্পদের সামান্যতম অংশও ভঞ্জচৌধুরীদের নেই, আছে শুধু অফুরন্ত স্মৃতি।···নিথর নিঃশব্দের মধ্যে ডুব দিয়ে শুধু পড়ে থাকার মধ্যেও কী অদ্ভুত মাদকতাময় আবেশ!···

এইভাবেই পড়ে থাকেন নিখিলেন্দ্র, ওইভাবেই বসে থাকে নিরুপমা। নিখিলেন্দ্রের চোখে অন্ধকারের যে অনন্ত সৌন্দর্য জমাট হয়ে থাকে, নিরুপমার চোখেও তাই। নিরুপমা যেন এ সময় ওই বিশাল বিরাট লোকটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।···নিরুপমা ওর অনুভূতির স্বাদ পায়।···কেউ কোন কথা বলে না, তবু যেন অনেক কথা বলার স্বাদ মেলে। দিন-রাত্রির আবর্তনে এইটুকুই সঞ্চয় নিরুপমার।

নিখিলেন্দ্র যেন নিরুপমার শুধু যনীয় আত্মীয়ই নয়, বন্ধু গুরু যার দেবতা।'

এও এক আশ্চর্য বৈকি! একই মানুষ একজনের কাছে মহৎ বিশাল পূজার দেবতা, আবার অন্য একজনের কাছে দাম্ভিক নিষ্ঠুর অহঙ্কারী।

তুষারকণা এই ছায়ার দিকের জানলাটা খুলে দেখেনি। তুষারকণা রৌদ্র রুক্ষ মাঠের দিকের দরজাটা হাট করে খুলে ফেলেছিল। হয়ত দোষও নেই তুষারকণার নতুন কনে হয়ে প্রথম

সিঁড়িতে উঠতে গিয়েই তার চোখে পড়েছিল একজোড়া ভয়াবহ শিংসহ একটা ঝুলেপড়া মোষের মুখ।···

বর বিজয়েন্দ্র সগৌরবে বলেছিল, 'বাবার শিকার করা।'

বুকটা হিম হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট নতুন কনের।···তার পিতৃবংশে শিকারের চাষ নেই।

আজ যেন স্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছেন নিখিলেন্দ্র। তাঁর রচিত সেই বংশতালিকার প্রতিটি পুরুষ যেন সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমরাও ছিলাম একদিন।'

কারো কারো পোর্ট্রেট আছে, কারো রংদার ফটো। আসল বিলিতি সাহেবের হাতের কাজ।···তাঁদের চেহারাগুলো স্পষ্ট জীবন্ত।···

কিন্তু নিখিলেন্দ্র এমনি কোন এক রাত্রে ওই বনভূমির অন্ধকার থেকে উঠে এসে কার সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন, 'আমিও ছিলাম একদিন।'

এই গভীর স্তব্ধতাটি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে গেল, প্রচণ্ডভাবে নয়, মৃদু রেখায়।

'মামা, আলবোলার শব্দ পাচ্ছি না?'

নিরুপমার সেই মৃদুতার মধ্যে ব্যাকুলতা।

নিরুপমা কোন দিন এমনভাবে স্তব্ধতাকে অশুচি করে দেয় না ব্যাকুল প্রশ্নে। অনেকক্ষণ এমনি চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বোধ হয় মনে পড়ে যায় নিখিলেন্দ্রের, এখানে আর একজন আছে, তখন বলেন, 'রাত হল রে নিরু শুয়ে পড়গে যা।'

তখন নিরুপমা সাহস পায় একটু হেসে কৌতুকের গলায় বলে, 'আর বুড়ো মানুষদের বুঝি রাত হয় না?'

নিখিলেন্দ্র খুব গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলেন, 'এখানে আবার বুড়ো কে এল?'

নিরুপমা এর উত্তরে বলতে সাহস অর্জন করে, 'আসে নি বুঝি ? আমি ভাবছিলাম বুঝি কেউ এসেছে।'

নিরুপমার চোখে নিখিলেন্দ্রর আঠারো বছর আগের চেহারা লেগে আছে, নিরুপমা সেই চেহারার মাথার চুলগুলোয় শাদা রং মাখায়, গায়ের চামড়াগুলোকে কুঁচকে দেয়, রংটা তামাটে করে আনে, তারপরই কেমন গুলিয়ে ফেলে।

এক একদিন ভাবে, যশোদাকে জিগ্যেস করবে, 'এখন মামা কী রকম দেখতে হয়ে গেছেন ?' জিগ্যেস করতে পারে না, দৈন্যটা বড় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, নিজেকে বড় বেচারী মনে হয়।

কথা খুব কম দিনই কয়। আস্তে উঠে দাঁড়ায়, যশোদাকে ডাকতে হয় না, এসে হাত ধরে।

আজ নিরুপমা কথা কয়ে উঠল।

নিখিলেন্দ্র চমকে উঠলেন, যেন কোন অতলতার নীচে থেকে বলে উঠলেন' 'অ্যাঁ।'

'বলছি আজ আলবোলার শব্দ হচ্ছে না কেন ? আমার খুব ভয় করছে।'

নিরুপমা যেন তার অসতর্কতার কৈফিয়ৎ দিল।

নিখিলেন্দ্র অবাক হলেন, বললেন 'ভয় ? ভয় করছিল তোর ?'

নিরুপমা বেশী কথা বলে না, তাই গুছিয়ে বলতেও পারে না, তাড়াতাড়ি বলল, 'মনে হচ্ছিল আমি একা বসে আছি, আপনি চলে গেছেন। খুব ভয় লেগে গেল।'

নিখিলেন্দ্র আস্তে গম্ভীর হেসে বললেন, 'একদিন তো আমায় চলেই যেতে হবে নিরু। তোকে তো একাই বসে থাকতে হবে।'

'মামা !'

নিরুপমার ব্যাকুল স্বর যেন দেয়ালে দেয়ালে আছড়ে পড়ল। নিরুপমা ব্যাকুল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কানামাছি খেলার চোখবাঁধা

চোরের মত শূন্যে দু'হাত মেলে বলে উঠল, 'মামা, আপনার তো বন্দুক আছে।'

ওর আগের কথাটার সঙ্গে এই কথাটার পারম্পর্য কী সেটা খুঁজে না পেয়ে নিখিলেন্দ্র আরো অবাক হন। চিন্তিতও হন, দুর্ভাগিনী দৃষ্টিহীন মেয়েটার কি আবার মাথার গোলমালও দেখা দিল? পিতৃরক্তের বিষাক্ত বীজ কত দিকেই তো আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

তবু চিন্তা রেখে শান্ত গলায় বললেন, 'আছে তো। তা হঠাৎ বন্দুকের কথা যে? কী করব? ভূত তাড়াব?'

শেষের দিকটায় কণ্ঠস্বরে একটু কৌতুকের আমেজ লাগালেন।

নিরুপমা সে কৌতুকে মন দিল না। আবার ধপ করে বসে পড়ে তেমনি ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, 'আপনি, আপনি, আপনি চলে যাবার আগে আমায় গুলি করে মেরে ফেলবেন।'

নিখিলেন্দ্র স্তম্ভিত হলেন।

না, একথা—মাথা খারাপের কথা নয়, মনের গভীর থেকে উঠে আসা আর্তনাদ। এই আর্তনাদের পৃষ্ঠপটে যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল ওর নিঃসহায় মনটার ক্ষতবিক্ষত ছবি। একসরে প্লেটে যেমন ফুটে ওঠে ভিতরের ব্যাধিবিক্ষত ছবি।

নিখিলেন্দ্রনাথ নামের ইস্পাতকঠিন লোকটাও যেন এ ছবি দেখে কেঁপে উঠল।

সেই কাঁপা গলাকে সামলাতে পারলেন না নিখিলেন্দ্র, বললেন, 'গুলি করে মেরে ফেলব? তোকে? বাঃ বাঃ! এই সমাধানটা তো এতদিন নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরীর মাথায় আসেনি। জীবনে তো অনেক বাঘ, ভালুক, হরিণ, শুয়োর শিকার করেছি, যাবার আগে শেষবেশ একবার একটা সৌখিন শিকার করে যাব তাহলে? অ্যাঁ!'

'মামা আপনি রাগ করলেন? নিরুপমা করুণ গলায় বলে, 'আমি যে আর কিছু ভেবে পাই না, মামা।'

নিখিলেন্দ্র চাঙ্গা হয়ে উঠে বসলেন, বললেন, 'আয় আমার কাছে এসে বোস।'

এ নির্দেশ অভাবনীয় কখনো এমন অন্তরঙ্গ স্নেহের পরিচয় তিনি দেন না। দরজার কাছে খাড়া বসে থাকা যশোদা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে বলে, 'এসো নিরুদি।'

নিখিলেন্দ্র আস্তে ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, 'তোর এইসব দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও কোন মহৎ ছেলে যদি তোকে বিয়ে করতে রাজী হয় নিরু, তুই রাজী হবি?'

নিরুপমার কি এমন প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুতি ছিল? তাই চমকে উঠল না, শুধু একটু বিদ্রূপের মত হেসে বলল, 'মহৎ? আপনার বিষয়সম্পত্তি, টাকা-কড়ির লোভে হয়ত কেউ তেমন মহৎ হতে পারে মামা, কিন্তু তাতে কী লাভ?'

নিখিলেন্দ্র ক্রমেই অবাক হন, এযাবৎ মেয়েটাকে অপরিণতবুদ্ধি বালিকা বালিকা ধরনের ভাবতেন ও যে এতটা তলিয়ে চিন্তা করতে পারে ধারণা ছিল না।

নিখিলেন্দ্র তো ওই বিষয়সম্পত্তি টাকাকড়ির টোপ ফেলেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন স্থির করেছিলেন। এখন অন্য কথা বলতে হল। বললেন, 'পৃথিবী থেকে সমস্ত মহৎপ্রাণ কি নিঃশেষ হয়ে গেছে নিরু? যদি কোন লোভ না দেখিয়েও পাই?'

'মামা ও কথা থাক। আমার মতন একটা অভিশপ্ত জীবনের মরায় কার কী ক্ষতি? আমার জন্যে কি কেউ কাঁদবার থাকবে?'

নিখিলেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন।

দেখলেন আর কেউ না কাঁদুক নিরুপমা নিজেই কাঁদছে সেই মূল্যহীন প্রাণটার জন্যে। বড় বড় ফোঁটায় ঝরে পড়া সেই জলকে তাড়াতাড়ি মুছে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয় বলেই বোধ হয় সেগুলোকে মাটিতে পড়তে দেবার জন্যে মুখটা নীচু করেছে।

অদ্ভুত একটা ব্যবহার করলেন এখন নিখিলেন্দ্র, হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন। জোর হাসি। বললেন, 'তোর মাথাটা তো খুব পরিষ্কার দেখছি। অনেক দূর অবধি ভেবে বসে আছিস।···তবে ভয় নেই, মামা এক্ষুণি মরছে না বাবা! প্ল্যানটা ঠিক করা থাকল' যেদিন দেখব এবার মরা উচিত, না মরলে ভাল দেখাচ্ছে না, পটাপট দুটো গুলি খরচা করে ফেলব। আগে তোকে 'ফিনিশ' করে তৎপরে নিজেকে খতম করে দেব। বাঃ, বাঃ! কী জমজমাট নাটকীয় দৃশ্য। ভেবে রোমাঞ্চ হচ্ছে রে। মরার পরও লোকে ধন্য ধন্য করবে। বলবে, 'হ্যাঁ লোক একখানা ছিল বটে!'

আবার হেসে ওঠেন।

নিরুপমার চোখে জল, তবু নিরুপমা হেসে না ফেলে পারে না।

কিন্তু ওই হাসির পর নিরুপমার মুখে আবার ভয়ের ছায়া নামে। আর ওর গলাটা কেমন আচ্ছন্নের মত লাগে, 'কী যে একটা মনে হয় মামা আমার আজকাল।··মনে হয় এ বাড়ির সব কিছু যেন হারিয়ে যাচ্ছে, শূন্য হয়ে যাচ্ছে, ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।·· যেন কোথায় কোথায় নানা রকমের শব্দ! আসবাবপত্র টেনে সরানোর শব্দ, দরজা খোলা বন্ধর শব্দ, মানুষের হাঁটা-চলার শব্দ। কে যেন কোথায় ফিসফিস করে কথা কয়, কী যেন বলাবলি করে···আর মনে হয় সব ফাঁকা হয়ে গেল। আপনার মনে হয়?'

নিখিলেন্দ্র গম্ভীর গলায় বলেন, 'রাতে তোর ঘুম ভাল হয় না বুঝি?'

'কত তো ঘুমোই মামা!'

'তবে অতসব শুনিস কখন?'

'এমনি এমনি শুনতে পাই। দিনের বেলাই শুনি। কী যেন বুঝতে পারি। আর ভয় হয়।···মামা হঠাৎ একদিন যদি দেখেন সব ফাঁকা, সব খালি?'

নিখিলেন্দ্রর সুবঙ্কিম রেখায়িত ঠোঁটের এক কোণে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু নিরুপমা দেখতে পায় না।

অতএব ওই হাসিটাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করেন না নিখিলেন্দ্র।

বেশ জোর গলায় বলেন. 'কেন আজকাল তোর এমন ভয় বেড়েছে বুঝতে পারছি নিরু। তোর মাথাটার মধ্যেই ভূতের বাসা হয়েছে।'...

তারপর আলবোলার নলটা হাতে তুলে নিয়ে মুখে ঠেকিয়েই বলে ওঠেন, 'এঃ! সুখেন ব্যাটা কী তামাক দিয়ে গেছে? আগুন নেই।...সুখেন—এই ব্যাটা সুখেন—।'

নিরু কারুর প্রতি দোষারোপে ভয় পায়, নিরু জাগতিক সমস্ত ঘটনার স্বাদ পায়, কেবলমাত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয়টা দিয়ে তাই সেই ইন্দ্রিয়টা যেন সর্বদা আতঙ্কিত হয়ে থাকে, পাছে ধাক্কা লাগে। নিরু তাই বকাবকির নামেই সামলায়। তাড়াতাড়ি বলে, 'আগুন ছিল মামা, নিভে গেছে।'

নিখিলেন্দ্র আবার হেসে ওঠেন. 'ঠিক ধরেছিস নিরু। ঠিক। আগুন ছিল নিভে গেছে।...ঠিক ঠিক।'

নিখিলেন্দ্রর গলার স্বরে যেন পরম শান্তি।...শান্তি আর ক্লান্তি।

যেন যুদ্ধ শেষে ক্লান্ত যোদ্ধা শিবিরে এসে হাতিয়ারটা নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নিতে বসল।

শিপ্রার মধ্যে অহর্নিশি এক দুর্নিবার আগুন। ইচ্ছে পূরণের আগুন, ভালবাসবার আর ভালবাসা পাবার আগুন, ভালবাসার জনের নিরুত্তম চিত্তকে আপন হৃদয় তাপে জ্বালিয়ে নিয়ে, দুজনে একসঙ্গে মশাল হয়ে জ্বলতে যাওয়ার আগুন।...

তবে এ আগুনে আর কারো কিছু ক্ষতি হচ্ছে না, হচ্ছে—মনুজের। এ আগুনে মনুজের হাড় জ্বলে যাচ্ছে।

ভেবে পাচ্ছে না মনুজ, শিপ্রা হঠাৎ মনুজদের সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত

বাড়িখানার প্রেমে পড়ে গেল কেন। আর কেনই বা মনুজকে তার সেই চিরঅপরিচিত পাষাণপুরীতে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছে।

সত্যিই শিপ্রার দারুণ অস্থিরতা।

মনুজ যদি বলে, 'আমার দ্বারা হবে না।'

শিপ্রা বলে, 'তার মানে তুমি আমায় ভালবাস না।'

মনুজ যদি বলে, 'তোমার এই অর্থহীন খেয়ালের কোন মানে হয় না।

শিপ্রা বলে, 'খেয়াল তো অর্থহীনই হয়। অভিধান দেখো।—'

মনুজ যদি বিরক্ত হয়ে বলে, 'একটা সর্বস্বান্ত অভিশপ্ত বাড়ি, সেটা একবার দেখে কী ঘটে গেল তোমার মধ্যে? ভূতে পেল না কি?'

শিপ্রা বলে, 'ধরে নাও তাই, ভূতেই পেয়েছে।'

মনুজ যখন সত্যি চটে গিয়ে বলেছে, "রাজবাড়ি' শব্দটাই দেখছি তোমায় মোহগ্রস্ত করেছে। তোমার মধ্যে যে এমন লোভ ছিল তা জানতাম না।'

শিপ্রা কিছুমাত্র অপমানিত না হয়ে বলেছে' 'তোমার মধ্যে যে কী আছে, আর কী না আছে, তার সবই তুমি জেনে ফেলেছ ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলে বুঝি?'

মনুজ বলেছে, 'আমি হঠাৎ একটা মেয়েকে নিয়ে সেই অদেখা ঠাকুর্দার কাছে গিয়ে হানা দিলাম, একথা যে কী করে ভাবছ, আমিতো ভাবতেই পারছি না।'

শিপ্রা গভীর গম্ভীর গলায় বলেছে 'ওভাবে কথা বোলো না মনুজ, ওতে তোমারই অপমান। একটা মেয়েকে নিয়ে নয়, তোমার ভাবী-স্ত্রীকে নিয়ে।'

'কিন্তু যাবার তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে? কারণ থাকবে?'

শিপ্রা উত্তর দিয়েছে, 'বিয়ের আগে বংশের প্রধানের কাছে আশীর্বাদ নিতে যাওয়া এটাই উদ্দেশ্য, এটাই কারণ।'

'প্রধান বলে কবে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বল?'

'হয়নি, হবে! একটা ভুল করা হয়ে গেছে বলে সে ভুলের আর সংশোধন হবে না?'

মনুজ হতাশ হয়ে অন্যপথ ধরেছে। বলেছে, 'মা আহত হবেন।'

শিপ্রা জোর দিয়ে বলে, 'কখ্খনো নয়। আচ্ছা আমি নিজে গিয়ে জিগ্যেস করব।'

তখন আবার ভয় পেয়ে গেছে মনুজ, তাড়াতাড়ি বলেছে, 'এই! মার কাছে তোমার যাওয়া-টাওয়ার দরকার নেই। যদি বলতে হয় আমিই বলব।'

'যদি বলতে হয় নয়, বলতেই হবে।'

তারপর চোখে আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে বলেছে, 'মার কাছে কি এখনো আমার কথা কিছুই বলনি, তাই এত ভয়?'

'বলব না কেন? যা বলবার ঠিকই বলেছি। তবে হঠাৎ তোমায় নিয়ে মার সেই দুর্বাসা শ্বশুরের কাছে গিয়ে হাজির হব, এমন কথা বলিনি।'

'আমি তোমার একটা ভুল ভাঙতে চাই। তোমার, তোমাদের। ...সেই ভদ্রলোককে তোমরা যা ভাব তিনি হয়ত তা নন।'

'একবার ক'মিনিটের জন্যে দেখেই তুমি বুঝে ফেললে?...তা-ও তো নিঃসন্দেহ নও, ভাবছ কাকে না কাকে দেখেছ।'

'বেশতো নিঃসন্দেহ হতেই না হয় একবার চল।'

মনুজ হতাশ হয়ে বলেছে, 'কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, গিয়ে তোমার কী হাত-পা বেরোবে!'

তখন শিপ্রাও হতাশ গলায় বলেছে 'আমিও ভেবে পাচ্ছি না মনুজ ওই বাড়িটা আমায় এমন করে টানছে কেন?' কেন মনে হচ্ছে

যেতেই হবে ওখানে। ওটাই যেন এখন আমার একমাত্র জরুরি কাজ।'.....

তারপর আবার খুব নরম গলায় বলেছে, 'তুমি শুনলে হাসবে মনুজ, আমি যেন অবিরত ওই বাড়িটার স্বপ্ন দেখি। যেন লাল বেনারসী পরে সোনার সিঁথিমৌড় মাথায় দিয়ে ওই শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দিয়ে উঠছি—

মনুজ মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'সর্বনাশ, তুমি আবার লাল বেনারসী—সোনার মুকুটের স্বপ্নও দেখছ! আমার হিসেব তো স্রেফ সাড়ে পাঁচ টাকায় বিয়ে!'

'আহা! আমার দাদা বুঝি তাতে রাজী হবেন?'

'আমার নীতিটা তাঁর কাছে ঘোষণা করব।'

'ফল হবে না। দাদা আমার বিয়ের জন্যে বেশ কিছু টাকা আলাদা করে রেখেছেন।'

মনুজ তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'তবে বাবা একটা সত্যি রাজপুত্তুর টুত্তুর বাগিয়ে তার সঙ্গে কোনো প্রাসাদে গিয়ে ওঠগে।'

শিপ্রার দুই চোখে কাঁপন, শিপ্রার দু ঠোঁটে হাসি তিরতির করছে, 'সত্যি রাজপুত্তুরই তো বাগিয়েছি।'

এরপর মনুজ ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, শাস্ত্রসম্মত হিন্দু বিবাহ অর্থাৎ চোল টোপরের বিয়েতে তার দুটো প্রকাণ্ড বাধা, এক শিপ্রার সঙ্গে তার জাতের অমিল, আর হচ্ছে তুষারকণা তাঁর বড় মেজ দুই ছেলেকে বসিয়ে রেখে ছোট ছেলের মাথায় টোপর তুলে দিতে চট করে রাজী হবেন কিনা।'

এ কথায় শিপ্রা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, 'তোমার দাদারা তো বাপু 'বিবাহের চেয়ে বড়য় বিশ্বাসী, তোমার মা কি আর ওঁদের কব্জা করতে পারবেন?'

তারপর মনুজ চুপ করে গেল দেখে হাসিটা সামলে নিয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে মনুজ হাল্‌কা গলায় বলেছে, 'বেশ, না হয় বিয়েটীয়ে সেরে দু'জনে গিয়ে সেই বংশের প্রধানের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আসা যাবে।'

'অর্থাৎ বিপদটাকে আপাততঃ ঠেকাতে চাইছ!' শিপ্রা তার মুখে চোখে আদি-মানবীয় জেদ প্ররোচনা আর লাবণ্যের মদিরতা মিশিয়ে বলেছে, 'ওসব চলবে না, আমি লাল চেলির শাড়ি পরে মুকুট মাথায় দিয়ে ওই শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে আলতার ছাপ দিয়ে দিয়ে উঠব, আর তুমি মশাই, ওই বাড়ির দেউড়ি থেকেই টোপর মাথায় দিয়ে বেরোবে।'

'শিপ্রা' সবার আগে তোমাকে একবার একটা সাইকো অ্যানালিসটের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

শিপ্রার মুখে আবার সেই লাবণ্যমদির হাসি, হেসে বলে, 'এতেই এই? তাহলে তো তোমায় সারাজীবন একজন সাইকো-অ্যানালিস্ট্ পুষে রাখতে হবে।'

দৃষ্টিহীন নিরুপমা কোথায় যেন সে সব শব্দ পায়, জিনিসপত্র সরানোর, মানুষের হাঁটা চলার, ফিসফিসিয়ে কথা বলার, সেগুলো কি ভুল? ওর মাথার মধ্যে ঢুকে পড়া ভূতের কার্যকলাপ? নিখিলেন্দ্রনাথ যাই বলুন, দৃষ্টিশক্তিহীনেরা কখনো অনুভূতির ক্ষেত্রে 'ফেল' করে না।

নিরুপমা যখন কোথায় যেন মানুষের হাঁটাচলার, ফিসফিস কথা বলার শব্দ পাচ্ছিল, তখন নিরুপমার ওই 'ভিতর মহলের' ঘরের দেওয়ালের ওপিঠে লাইব্রেরী ঘরে মদন ঘোষ আর ব্রজেন দাস, একটি নবনির্মিত চাবি হাতে নিয়ে মৃদু কথাবার্তা চালাচ্ছিল।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা অভিজাত গড়নের খানিকটা টানা উঠে গিয়ে দু'ধারে ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকেরটা গিয়ে পড়েছে সেই বারান্দায় যেখানে নিখিলেন্দ্রনাথ ঋতুতে ঋতুতে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে বসে থাকেন, কখনো সোফায়, কখনো আরাম কেদারায়।.....

এই বারান্দার ধারে ধারেই বসতমহল।·····আর বাঁ দিকেরটা গিয়ে পড়েছে দোতলার হল্‌এ, যার বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পেন্টিং করা দেওয়ালগুলো মৌন মুখে বসে আছে উদাসীন দৃষ্টি মেলে।·····এখন আর ওদের দেখলে বোঝবার উপায় নেই, ওরা কত সমারোহের আর কত উন্মাদ-উল্লাসের সাক্ষী। ওদের বালি পাথরের আস্তরণের পরতে পরতে ঘুমিয়ে আছে কত নূপুর নিক্কন, কত সুরেলা গলার কারুকার্যময় সঙ্গীত মাধুরী, কত বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র ধ্বনি, কত কাঁচের ঝনৎকার, কত হাহা-হাসির অট্টরোল।

নিখিলেন্দ্রর ঠাকুর্দা ছিলেন খুব রসিক, (অবশ্য সুরারসিকও) দেশ-বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ করে আনতেন ওস্তাদ-শিল্পীদের, নামকরা বাইজীদের। নিজেও ছিলেন একজন উঁচুদরের পাখোয়াজী।

নিখিলেন্দ্রর বাবার আমলে এসে ঢুকেছে সাহেবীয়ানার হাওয়া, উৎসবের জাত বদলেছে, সমারোহের চেহারা বদলেছে, ঘরের সাজসজ্জারও বদল ঘটেছে, তবু সুর ও সুরার প্রাধান্য লোপ পায়নি। ···নিখিলেন্দ্রর বাল্য শৈশব এই আবহাওয়াতেই বর্ধিত।···কিন্তু তার সঙ্গে আর এক হাওয়া, তখন কায়েমী আসন গেড়ে বসে আছে, সেটা ইংরেজি শিক্ষা।

নিখিলেন্দ্রর বাবা সেই নতুন নেশায় লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করে চলেছেন।

সোনার জলে নাম লেখা, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো ইংরেজি সাহিত্যের দুর্লভ সব সেট্‌ এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন মেহগিনির আলমারিতে।·····

সেই লাইব্রেরী-ঘরের অপর পিঠে ভিতর মহল। এখন যে মহলের অধিকারিণী অন্ধ নিরুপমা।

নিরুপমা দেওয়ালে কান পেতে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা বলার শব্দ বুঝতে পারে। কথা বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারার গলাতে হচ্ছেও না কথা। শুকনো পাতায় হালকা-হাওয়া লাগার মৃদু শব্দের মত তাদের ষড়যন্ত্রের গলা।

ব্রজেন এ সংসারের অনেক চাবির ডুপ্লিকেট করিয়েছে, অনেক দিনের অধ্যবসায়ে। চল্লিশ বছরকাল এখানে আছে ব্রজেন। রান্নামহলের ঝি বিন্দুর সঙ্গে এসেছিল তার দেশের 'বোনপো' হিসেবে। চারহাতি একখানা মোটা ধুতি পরণে, আদুল গায়ে প্রকট হয়ে উঠেছে জিরজিরে হাড়। তদবধি আছে। সংসারের চাবিগুলোর ডুপ্লিকেট বানিয়ে নেবার অবকাশ পেয়েছে প্রচুর।·····

বর্তমানের এই 'ভাঙা-মেলার' লাইব্রেরিয়ান মদন ঘোষের হাতে ধরা পড়ে গেল একদিন।

বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি আলমারি থেকে অন্তর্হিত।

মদন ঘোষ যখন 'রাজা সাহেবের' কাছে এ খবর পেশ করবার হুমকি দেখাল, তখন ব্রজেনও দেরাজে তুলে রাখা দামী দামী গালচে আর পর্দার 'সেটের কথা তুলল'। দেরাজগুলো ফাঁকা হয়ে যাবার খবর তো ব্রজেন তার নিজস্ব চাবির গোছা থেকে জেনে ফেলেছে।

অতএব ক্লেদাক্ত দুই হাতকে একত্রে মেলাতে হয়।···এবং সেই সূত্রে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটে, দুজনেরই অতি গোপন মাল চালানের কেন্দ্র একই। ভঞ্জ চৌধুরী বংশের দুই বংশধর অধিকারের দাবিতে নিয়ে যাবার যুক্তি দেখালেও কমিশনটা দিচ্ছে ভালই।

'সাপ্লায়ার দু'জনও ভেবে দেখেছে, এর চাইতে নিরাপদ চালান আর কিছু হতে পারে না। তারা কোথায় গছাতে যাবে এই ধনী গৃহের দুর্লভ দ্রব্যসমূহ?···কর্তা পটল তোলার সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি সব সরানোর পরিকল্পনাটা অতএব এই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

অবশ্য এখন আবার কমিশনের বখরা নিয়ে গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে। যে যা পাচার করছিল নিজ স্বাধীনতায় করছিল, এখন সে স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে, কমিশনের অঙ্ক জানাজানি হয়ে যাচ্ছে।·····

আর চল্লিশ বছরের পুরনো খাশ চাকর ব্রজেন, বত্রিশ বছরের পুরনো কেয়ার-টেকারকে জুনিয়র ধরে নিয়ে প্রাপ্য পাওনায় সিনিয়রিটির দাবি করছে।

এই চাপা উষ্ণতা ফিসফিসানির মাত্রা ছাড়িয়ে যে উচ্চতাটুকুতে পৌঁছেছে, তা নিরুপমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে ধাক্কা মেরে মেরে ব্যাকুল করছে, উদভ্রান্ত করছে।

নিরুপমা এই ভার বেশীক্ষণ বহন করতে পারে না, ব্যাকুল গলায় ডাকে 'যশোদাদি!'

যশোদার সাড়া মেলে না।

ঠিক এ সময় নিরুপমার কোনো দরকার থাকে না, তাই সে অন্য কাজে চলে গেছে। দেখে গেছে নিরুপমা জানলার ধারে চেয়ারে বসে দুটো কাঠি নিয়ে পশম বুনছে · · জানলার ধারটা যে নিরুপমার কোন কাজে লাগে তা জানে না যশোদা, সে তো জানে অন্ধের কি বা রাত্রি, কি বা দিন! কি বা আলো—কি বা আঁধার, কিন্তু নিরুপমা কেবলই বলে আমার চৌকীটা জানলার ধারে দিয়ে দাও যশোদাদি।'

নিরুপমা আবার মৃদু গলায় ডাকল, 'যশোদাদি।' পরিবেশ তেমনি সাড়াহীন। নিরুপমার মনে হয় সমস্ত বিশ্ব জগৎই নিঃসাড় হয়ে গেছে।

নিরুপমা ভয় পায়। উঠে পড়ে।

নিরুপমা আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে যায় ঘর থেকে প্যাসেজে, প্যাসেজ থেকে বারান্দায়—এ বারান্দা থেকে ও বারান্দায়। অভ্যস্ত পা, অভ্যস্ত পদক্ষেপের গুনতি, কোনখানে কোন আসবাবটি বসানো আছে, ওর জানা। তবু একেবারে কুলে এসে তরী ডোবে। নিখিলেন্দ্র যেখানে বংশতালিকা রচনায় নিমগ্ন, তার হাত কয়েক দূরে দেওয়ালের ধারে রাখা একটা উঁচু লম্বা বাতিদানে ধাক্কা খায় বেচারী।

আচমকা ধাক্কা খেলে অসতর্কে উঃ বেরিয়ে আসেই, নিরুপমার-ও এল।···এ শব্দে চমকে ওঠেন নিখিলেন্দ্র, বলে ওঠেন কে—'

নিরুপমা অপ্রতিভ হয় দারুণ। লজ্জিত অপরাধীর গলায় বলে, 'মামা, আমি।'

'কী আশ্চর্য! তুমি এরকম একা? যশোদা কোথায়?'

নিরুপমা উত্তর না দিয়ে অদ্ভুত একটা কাজ করে। ঠোঁটের উপর একটি আঙ্গুল দিয়ে নিঃশব্দে ইসারা করে। তারপর অন্য হাতটা প্রসারিত করে লাইব্রেরীর ঘরের বারান্দার দিকটা দেখিয়ে দেয়। মেয়েটাতো আচ্ছা জ্বালালো। মাথার রোগ না হয়ে যায় না।

নিখিলেন্দ্র উঠে আসেন, আস্তে বলেন, 'কী ওদিকে?'

মুখের চাবি খুলে নিরুপমা ফিসফিসে গলায় বলে, 'তারা যারা কথা কয়, জিনিস হারিয়ে দেয়।'

নিখিলেন্দ্রর মুখে আজও সেই রাতের মত একটি সূক্ষ্ম হাসি ফোটে।··আবার ফিরে আসেন, 'বোস' বলে সযত্নে নিরুপমার একটা হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দিয়ে সহজ বলায় বলেন, ও কিছু না। ও নিয়ে ভাবনা করিস না। ক্ষয়ে যাওয়া বড়লোকদের বাড়িতে যখন, বাড়ির পক্ষে বাড়ির লোক কমে যায়, ওরকম সব ভূত প্রেত দত্যি-দানোর উৎপাত শুরু হয় রে নিরু!'

'ভূত নয় মামা', নিরু অধীর গলায় বলে, 'ওরা মানুষ।'

'আহা মানুষইতো একসময় ভূত হয় রে!'

'মামা ওরা মানুষের মত কথা বলছে।'

নিখিলেন্দ্র লেখার পাতাগুলোর উপর পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে গম্ভীর হাসির সঙ্গে বলেন, 'মানুষের মত কথা? তুই শুনেছিস?'

'হ্যাঁ মামা। আমার ঘরের দেয়ালে কান দিয়ে!'

'কী বলছিল?'

নিরুপমা হতাশ গলায় বলে, 'কথাগুলোতো বুঝতে পারি নি। কিন্তু মানুষের গলা মামা।'

নিখিলেন্দ্র বলে, 'স্থির হ' নিরু। আমি যা বলছি শোন।...ওরা মানুষের গলায় কথা বলে, কিন্তু মানুষের মত কথা বলে না। ভূত-প্রেতের মত কথা বলে।'

'তবে কী হবে মামা?'

যা হবার ঠিক তাই হবে নিরু। আমার আর ভূত তাড়াবার উপায় নেই। তাড়াতে গেলেই ওরা আমাকে চন্দ্রবিন্দু করে দেবে। ওদের হাতে আমার খাদ্য, আমার পানীয়।'

'মামা আমি, যে কিছু বুঝতে পারছি না।'

নিখিলেন্দ্র দৃঢ় গলায় বলেন, 'বলছি তো নিরু, তোকে কিছু বুঝতে হবে না। বোঝাতে বসে আমি তোর অন্ধকারের পবিত্রতাটুকুও নষ্ট করে দিতে রাজী নই।...ভূতের হাতে আর কতদিন পড়ে থাকতে হবে আমায় বল? ভগবান তো হাত বাড়িয়ে বসে আছেন।'

নিরুপমা তার চোখ হারিয়েছে আঠারো বছর বয়সে। তার আগে পৃথিবীর পূর্ণরূপও তার দেখা। তবু এখন সে তার অন্ধকারের জগৎটুকুকেই আঁকড়ে বসে আছে। নিখিলেন্দ্র কি ওর ভয় ভাঙ্গাতে গিয়ে সেই জগৎটাকে ভেঙ্গে দেবেন?

না। নিখিলেন্দ্র ওর সেই জগতের হঠাৎ খুলে পড়া একটা জানলার কপাটকে আবার চেপে বসান।

'বাড়িতে লোক নেই নিরু, প্রকাণ্ড তিন মহলা বাড়ি খোলা পড়ে আছে, ইন্দুর ছুঁচো, চামচিকে এদের উৎপাত হবেই। সেই সব শব্দ।...ও কথা ছাড়। একটু পরেই খবর হবে!...হাঁরে নিরু, তোকে ওরা ঠিক মত খেতে দেয়; ফল দুধ, মিষ্টি?'

নিরুপমা এই প্রসঙ্গান্তরে থমকে যায়। তারপর বলে, 'কেন মামা? দেয়তো!'

নিখিলেন্দ্র বিচিত্র একটু হাসি হেসে বলেন, তবু ভাল! হয়ত আর বেশীদিন দেবে না ··যার চোখ নেই, তার খাবার থেকে সরানো তো সবচেয়ে সোজা।···'

ঠিক এই সময় ঘড়ি থেকে সুরের পাখি সময়ের সঙ্কেত জানিয়ে যায়, আর ওরই মত নির্ভুল নিয়মে রেডিওর চাবিটা খুলে দিয়ে যায় রঞ্জেন। ··নিথর বাকসটা যেন চমকে দিয়ে ঝপ করে কথা কয়ে ওঠে, 'আকাশবাণী। খবর পড়ছি অনিল চট্টোপাধ্যায়। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর—'

তুষারকণাও মন দিয়ে শুনছেন, 'আকাশবাণী', কলকাতা। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর—'

মনুজ ঝুপ করে ঘরে ঢুকেই রেডিওটাকে কান মুলে বন্ধ করে দিয়ে বলে ওঠে, 'কী একঘেয়ে পচা খবর শুনছো? একটা লোমহর্ষক খবর শোন।'

'এই ছাখো। আগে দেশের দশের খবরটা শুনতে দে? তারপর তোর 'লোমহর্ষক' রোমাঞ্চকর সব শুনব বাবা!'

'না: অপেক্ষা করা চলবে না, এই শোনো'—

দরজার বাইরে শিপ্রা অপেক্ষা করছিল। আস্তে এসে ঘরে ঢুকে তুষারকণাকে প্রণাম করে। এ মেয়ে তুষারকণার অচেনা নয়, এবং যুবক পুত্রের মাধ্যমে কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে সে পরিচয়ের পরিণামটা কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে তাও তুষারকণার অজানা নয়, তাই এই হঠাৎ এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করা দেখে বুকটা কেঁপে ওঠে তুষারকণার। যেন হাজতে থাকা আসামীর বিচার চলছে, হঠাৎ রায় বেরিয়ে গেল, যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

তবু নিজেকে সামলে নিতে হয়, অবোধের ভাণ করতে হয়, হঠাৎ প্রণাম কেন? না বলে বলতে হয়, 'থাক থাক মা, সবসময় আবার প্রণাম কী?'

মনুজ শিপ্রার দিকে কটাক্ষপাত করে বলে, 'এ সময়তো করতেই হবে। সাষ্টাঙ্গে করলেই ভাল হয়।'

তুষারকণা কেঁচো খোড়েন না, টোকা দিয়ে পিঁপড়ে ঝাড়েন, 'কেন কী হল? পরীক্ষা?'

'কারেকট!' পরীক্ষা! নিদারুণ পরীক্ষা! শুনলে বিশ্বাস করবে না? এই 'দুর্দান্ত মেয়েখানি এখন কোথায় যাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।'

তুষারকণা এ কথায় অবাক হয়ে তাকান। এটা আবার কোন কথা।

মনুজই প্রগলভ হয়!

প্রগলভ না হয়ে উপায় কী?—এ রকম অসুবিধেকর অবস্থায় অপ্রতিভ হয়ে পড়লেই তো তোমার প্রস্তাবের বারোটা বেজে গেল। ...চড়াই উৎরাইয়ের পথ দ্রুতগতিতে উৎরে গেলেই ভয় কমে।

তুষারকণা চারিদিক হাতড়ে কিছু খুঁজে না পেয়ে বলেন, 'কোথায়?'

'অনুমান কর।'

তুষারকণা ওর ধার দিয়ে না গিয়ে বলেন, 'আমি কী করে জানব?'

'তা অবশ্য জানা অসম্ভব। এই নাছোড়বান্দা মহিলা জেদ ধরেছেন, তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশে না গিয়ে ছাড়বেন না।'

তুষারকণা যেন, এ সব কথার মানে বুঝতে পারেন না, বলেন, 'একটু খুলে বল মনু।'

'তাহলে তোমারই বলা উচিত শিপ্রা। মনুজ বলে, আমি তোমায় দরবার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি, এখন তোমার যা আর্জি আছে বল।'

তুষারকণা এবার একটু তীক্ষ্ণ হাসি হাসেন, হয়ত তিক্তও। সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় তিক্ত। বললেন, 'থাক ওকে আর নিজ মুখে

বলিয়ে কী হবে মনু!' আজি আমি বুঝে নিয়েছি, আমার শ্বশুর-বাড়িটা ওরও শ্বশুরবাড়ি হোক, এইটুকুই তো বলতে এসেছে। ও? তা নিজে এসে বলতে পারলি না? মেয়েটাকে জব্দ করা কেন?'

মনুজ বলে, 'আজি শুধু মাত্র ওইটুকুই যদি হত মা, একবার কেন একশো বার বলতাম। আবদার আরো অনেক বেশী। নিজের হবার আগে তোমার শ্বশুরবাড়িটাতেই যাবে ও, তুমি ওকে সেই বাড়িতে বরণ করে তুলবে, এই ওর লক্ষ্য। এর জন্যে মরণপণ করে বসে আছে।'

তুষারকণা গম্ভীর হয়ে যান, বলেন, 'যেটা তোমার নিজের হাতে নয়, আমার হাতেও নয়, তার জন্যে এমন অদ্ভুত পণ করে বসতে নেই মনু। পুত্রই যদি ত্যাজ্যপুত্র হয়ে যায়, পুত্রবধূর আবার অধিকার কোথায়? আমি কিসের জোরে ও বাড়িতে বৌ বরণ করে তুলতে যাব? কিন্তু হঠাৎ ওর এ খেয়াল কেন?'

মনুজ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'কী আর বলব মা, লোভ মোহ এই সবেই ওকে খেয়েছে। নর্থ বেঙ্গল বেড়াতে গিয়ে একটা পচা প্রাসাদ আর পোড়ো বাগান দেখে ওর মাথা ঘুরে গেছে। যদি বা শুধু আমায় বিয়ে করতে না চাইত, আমি ওই বাড়ির ছেলে বলে একেবারে ঝুলে পড়েছে। যত বোঝাচ্ছি, পরিচয়টা অস্বীকার করতে না পারলেও আমি ও বাড়ির কেউ নয়, মানছে না। বলছে বংশের প্রধান যখন এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর আশীর্বাদ নিতে যেতে হবে।'

তুষারকণা ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলেন, 'তবে যা। আমায় এর মধ্যে জড়াতে চাইছিস কেন?'

শিপ্রা এবার কথা বলে। বলে, 'একটা ভুল বোঝাবুঝি যদি হয়েই থাকে, চিরকাল ধরে তার জের টেনে চলাই কি ভাল?'

তুষারকণা মৃদু হেসে বলেন, 'এখনো ছেলেমানুষ আছ মা, জীবনের অভিজ্ঞতা কম, তাই জান না, এমন কিছু কিছু ভুল

বোঝাবুঝি থাকে, তার জের টেনে চলা ছাড়া উপায় থাকে না। তবু তোদের আমি আশীর্বাদ করছি মনু, তোরা যেন এই সময় তোদের সেই একমাত্র জীবিত গুরুজনদের আশীর্বাদ পাস।...কিন্তু—'একটু থামলেন তুষারকণা, বললেন, 'হয়ত আমিও তাঁর এই শেষ জীবনের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে আসতাম, যদি তুই-ই আমার একমাত্র সন্তান হতিস। আমি কী করে ভুলব আমি দনু অম্বরও মা।'

তুষারকণার শেষ কথাটা হাহাকারের মত শোনাল।

আশ্চর্য!

প্রখর যৌবনে একদা যে বিলাসময় প্রাসাদপুরীকে ত্যাগ করে এসেছিলেন তুষারকণা ঘৃণায়, ধিক্কারে, ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায়, তেজে, আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে সেই পুরীর জন্যে মন কেমন করে তুষারকণার।...সেই বার মহল, ভিতর মহল, তার প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কত কক্ষ, কত গবাক্ষ কপাট, কত অলিন্দ চত্বর সিঁড়ি ঠাকুরবাড়ি রান্নাবাড়ি, আর অদ্ভুত সৌন্দর্যময় সেই ছাদ! সেতুর মত সরু সরু বারান্দা দিয়ে সব মহলের সঙ্গে যুক্ত করা সেই ছাতে উঠলে মনে হত তুষারকণা নামের মেয়েটা অনায়াসেই এখান থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

উত্তরের সেই বারান্দাটায় গিয়ে এখন বসতে ইচ্ছে করে, যেখানে থেকে রাজবাগানের মর্মরিত ঝাউ গাছের শব্দ শোনা যেত দেখা যেত গভীর গাঢ় সবুজের সমারোহ!

শিপ্রা নামের ওই কোথাকার কে মেয়েটার উপর হঠাৎ তীব্র একটা ঈর্ষা হল তুষারকণার!

ডাকে আসা চিঠিপত্র বই প্যাকেট সব একটা সৌখিন বেতের ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে সামনের টেবিলে নামিয়ে রেখে মদন ঘোষ বলল, 'পোষ্ট অফিসে খবর নিয়ে এলাম, আপনার সেই বিলিতি বইয়ের পার্শেল আজও আসেনি।'

নিখিলেন্দ্র ওর মুখের দিকে অন্তর্ভেদী কৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ছেলেমানুষের মত বুড়ো আঙুল নেড়ে বলেন, 'ও আর আসবেও না। পোষ্ট অফিসের সঙ্গে কত বখরার হিসেব ছিল হে মদন?'

মদন আকাশ থেকে পড়ে, 'তার মানে?'

'মানে খুব সোজা মদন! লোভ জিনিসটা ক্যান্সারের বীজের মত, ও একবার দেহের মধ্যে আশ্রয় নিলে, হাড়ের মজ্জায় শিরায় শিরায়, দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে হাত-পা ছড়ায়, শেকড় বাড়ায়।'

মদন এবার আর আকাশ থেকে নয়, সোজাসুজি গোলক থেকেই পড়ে, আপনার কথা তো আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি না রাজাসাহেব!'

রাজাসাহেব হা-হা করে হেসে ওঠেন, 'তা সত্যি, তুমি একটু দেরীতেই বোঝ। তা নইলে তিরিশ বছর চাকরী করার পর তোমার খেয়ালে এল, তোমার মত পোষ্টে যারা থাকে, নেমকহারামি করবার প্রচুর সুযোগ তারা পায়। আগে খেয়াল হয়নি, তা হলে আর ব্রজেন হতভাগাকে বখরা দিতে হত না।'

মদনের বোধহয় শুধু বুকই নয়, হাত পাও কাঁপে। মদন সেই বুকেও পাথর বেঁধে বলে, 'আজকে বোধহয় আপনার মেজাজ ঠিক নেই রাজাসাহেব, আমি যাই।'

রাজাসাহেব আঙুলের আগায় তাচ্ছিল্যের ইসারায় যেতে বলেন।

ব্রজেন সিঁড়ির তলায় বসে তামাক সেবা করছিল। মদন এসে রক্তমূর্তি হয়ে বলে, 'এই বেঁটে রাজাসাহেবের কাছে সুয়ো হবার জন্যে আমার নামে চুকলি খেয়েছিস?'

ব্রজেনও আকাশ থেকে পড়ে, তবে এটা সত্যি পড়া। সেই পড়া থেকে মাথা তুলে বলে ব্রজেন, 'ভাল চাস তো মুখ সামলে কথা বল মদনা! ইস্তিরিকরা জামা-কাপড় পরিস বলেই ভদ্দর হয়ে গেছিস না? ওই শালা বুড়ো, চুকলি খাবারই লোক বটে।'

'তবে মাল পাচারের কথা, কমিশনের কথা, সব জানল কী করে?'

'ভগবান জানে! মাইরি মা-কালীর দিব্যি—মদন, আমার মুখ দিয়ে কিছু প্রকাশ হয়নি। আমি কি এমনই নির্বোধ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারব?'

'আচ্ছা!' মদন চাপা আক্রোশের গলায় বলে, 'খবর নিচ্ছি আর কে গুপ্তচরের কাজ করছে।...মরি তা মেরে মরব। বলি তোর ওই ভাগ্নেটা নয় তো? হারামজাদা সুখেন?'

ব্রজেন ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'মুখ খারাপ কোরো না মদন ঘোষ। সে এসবের ছন্দ অংশ জানে না?'

মদন মুখ ভেঙিয়ে বলে, 'না, জানে না! মায়ের কোলের খোকা! ওর পেটে পেটে শয়তানি! ন্যাকা সাজে! বসত-ঘর ঝাড়মোছ করে, ও কিছু সরায় না বলছিস? বলে কথাতেই আছে বড় গোলার তলা। রাজারাজড়ার ঘরে যেখানে সেখানে রুপোর কারবার। আয়না চিরুনি তেলের শিশি সাবানদানি, রানীমার তো সবই রূপো-বাঁধানো ছিল। সে সব আছে আর?'

ব্রজেন দার্শনিক গলায় বলে, 'জগতে কিছুই থাকে না হে মদন ঘোষ। রাবণ রাজার স্বর্ণলঙ্কার সোনার পেরেক ইস্কুর একটা খুঁজে পাবে তুমি? এলোমেলো হয়ে গেলেই পাঁচজনে লুটে-পুটে খাবে।'

কথাটা ভুল বলেনি ব্রজেন।

'বিশ্বাসভঙ্গ' জিনিসটা একটা ছোঁয়াচে রোগের মত। একজনকে ওটা করতে দেখলে অন্যজনেরও সততার মূল আলগা হয়ে যায়।

চুরিটা যতক্ষণ সুড়ঙ্গপথে আনাগোনা করে, ততক্ষণও রোগ ছড়ায় না, কিন্তু যখন সুড়ঙ্গপথে আর কুলোয় না তখনই এপিডেমিক লাগে।

ওরা যতই নিজেকে সাবধানী ভাবুক, ব্রজেন—কোম্পানীর কার্য-কলাপ দাসদাসী কারো আর টের পেতে বাকি থাকছে না।

রান্নাবাড়ির ঝি, বাসন মাজার ঝি, এরাও এখন আর তাই দু' দশটা বাসনপত্র সরানো খুব গর্হিত মনে করছে না। দ্রুত বাড়ছে।

বুড়ো যতক্ষণ আছে ততক্ষণই বরং সুবিধে।...সংসার পুরনো নিয়মে খোলা আছে, কে বলতে পারে বুড়ো মরার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে পাহারা বসাবে, না কি হঠাৎ সেই ওয়ারিশান নাতিরা এসে হাজির হয়ে পুরনোদের গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। বড়বাড়িদের শেষ ইতিহাসতো প্রায়শ.ই এই।

তাই বলে সত্যিই কি পৃথিবী 'মানুষ'-শূন্য?

বড়বাড়ির চিরদিনের পোষ্যরা সবাই কি সামনে 'রাজাসাহেব' আর পিছনে 'শালা বুড়ো' বলে?

বুড়ো কাসেম আলী?

বাগান দর্শকের কাছে যতই নজরানা নিয়ে ট্যাঁকে পুরুক, 'মালিক' তার কাছে খোদাতালার পরের ধাপেই!...মরা বাগান থেকেও প্রতিদিন সকালে একটি করে ফুলের তোড়া বানিয়ে নিয়ে সে সেলাম জানাতে আসে তার আজীবনের মালিককে। হয়ত সে ফুলগুলোর মধ্যে 'জাত'-ফুলের ভাগ সামান্যই, হয়ত একেবারে বুনো আগাছার ফুলেও বাহার ঘটায়, কিন্তু যখন সেই তোড়াটি বাঁধে, তখন কাসেমের মুখ দেখলে মনে হয়, বুঝি বিগ্রহ সেবার নৈবেদ্য সাজাচ্ছে।

শীতের সকালে পুব বারান্দায়।

রঙীন শার্সিঘেরা বারান্দার ফিকে বেগুন আলোর আভায়, নিখিলেন্দ্র তাঁর রাজাসনে বসে আছেন প্রাতঃকালীন রাজবেশ পরে। সূর্যের দিকে মুখ, হাতে কিছু নেই, না বই, না কাগজ, না সিগার।

কাসেম আলী প্যাসেজ থেকেই বানানো কাসিতে নিজের আগমন ঘোষণা করে আস্তে এসে কাছে দাঁড়ায়। ফুলের তোড়াটা কাছের ত্রিপদীতে নামিয়ে রেখে নুয়েপড়া দেহটাকে আরো নুইয়ে সেলাম

করে নাটকীয় পদ্ধতিতে, তারপর তোড়াটাকে নির্দিষ্ট ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে, জল এনে ফুলদানিতে জল দেয়।

নিখিলেন্দ্রর মুখটা সকালের আকাশের মতই উজ্জ্বল আর প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বলেন, কি কাসেম আলী, তবিয়ৎ আচ্ছা।

কাসেম নম্র গলায় বলে, 'হুজুরের মেহেরবাণীতে আচ্ছাই হ্যায়।'

আজও ওই কুশল আদান-প্রদানের পর নিখিলেন্দ্র হেসে বলেন, 'এই দুনিয়ায় বহুৎদিন থাকা হল, কী বল কাসেম? তোমার আমার।'

কাসেম তেমনি ভঙ্গীতে বলে, 'খোদা হুজুরকে আরো বহুৎদিন জিন্দা রাখুন।'

কাসেম আলী বাঙালী মুসলমান, বাড়ি মেখলিগঞ্জে, তবু রাজাসাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময় সে নিজস্ব বাংলায় বলতে নারাজ। সাধ্যমত সাধুভাষা প্রয়োগ করে সে।

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'নাঃ কাসেম, এখন যেন জিন্দা থাকতে শরম লাগছে।'

'হুজুর গরীবের মা-বাপ!'

আরও একবার সেলাম করে কাসেম।

নিখিলেন্দ্র ওর জন্যে একটা জিনিস পকেটে মজুত রাখেন। কিছু মেওয়া। বাদাম আখরোট কাজু। বার করে ওর হাতে দেন।

বলেন, 'কাসেম ফুল দিলে—ফল নাও।'

কাসেম খোদাতালার কাছে আরো সাতবার রাজাসাহেবের নিরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করে বিদায় নেয়।

এরপর যশোদা এল প্রণাম করতে। রোজই আসে।

নিখিলেন্দ্রের আপত্তি গ্রাহ্য করে না। পা ছোঁয় না তবে মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হয়।

নিখিলেন্দ্র বললেন, 'আঃ মা যশোদা, তোমার আর এই বদভ্যাস গেল না। আমি তোমায় 'মা' বলি।'

যশোদা বলে, 'আর আমি যে আপনাকে 'বাবা' বলি বাবা।'

'তাহলে যুক্তিতে হারলাম। নিরুর মা উঠেছে?'

'কখন। ওর কি ঘুম আছে বাবা!'

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'একেবারেই ঘুম হয় না বলছ? তাহলে তো ডাক্তার দেখান দরকার।'

যশোদা আক্ষেপের সুরে বলে, 'ভগবান যাকে মেরেছে বাবা, ডাক্তারে তার কী করবে?'

তারপর একটু থেমে বলল, 'এদানী আবার এক 'ভয় ভয়' বাতিক হয়েছে—।'

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'ওটা তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে যশোদা।'

যশোদা তখন ইতস্তত করে আসল কথা পাড়ে, আজ যা বলবে বলে মনস্থ করে এসেছে। মানুষ যে কত নেমকহারাম হতে পারে, সেই নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে বলে, 'অনেক দিন ধরে আপনাকে বলব বলব ভাবি বাবা, সাহস হয় না। তলে তলে রাজবাড়ির অর্ধেক জিনিস পাচার হয়ে গেল—'

নিখিলেন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, 'জানি যশোদা।'

'জানেন? অ্যাঁ?'

'নিখিলেন্দ্র আবার হাসেন', 'তোমার অন্ধ নিরুদি যা টের পায়, তা দুটো চোখ নিয়ে টের পাব না?'

যশোদা মূঢ় গলায় বলে, 'তাহলে?'

'কী তা হলে?'

'শাস্তি করছেন না নেমকহারামদের?'

নিখিলেন্দ্র গাঢ় গলায় বলেন, 'শাস্তি দেবার উপায় নেই যশোদা, দিতে গেলে নিজের গায়েই ধুলো এসে লাগবে।···কিন্তু যশোদা, যারা তিরিশ-চল্লিশ বছরের নুন হজম করতে পারে, তাদের আর কি

শাস্তি দিতে পারতাম আমি?···প্রথম প্রথম ইচ্ছে হত গুলি করি, এখন আর সে ইচ্ছে হয় না, হাসি পায়।'

যশোদা ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, 'একটা মেয়েছেলের অভাবে সংসারের এই হাল বাবা! মেয়েছেলের চোখ সব পাহারা দিয়ে বেড়ায়। ভগবানের এমনি খেলা, একটা মেয়ে যদিবা রইল, তো চোখেই বঞ্চিত।'

নিখিলেন্দ্র এখন একটা সিগার ধরান—হেসে বলে, 'তুমি তো রয়েছ।'

'আমি? আমার পোড়া কপাল! একটা দাসীকে কেউ মানবে?'

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'যশোদা, দেখ্‌গে দিকি নিরু কি করছে।'

যশোদা বোঝে নির্বুদ্ধিতার বশে পাছে সে সীমা লঙ্ঘন করে বসে, তাই এই সাবধানতা। উঃ আগে কি কখনো ভাবতে পারত যশোদা, 'বাবা'র সঙ্গে এভাবে কথা বলবে?

নিরুপমার জন্যে তার মর্যাদা বেড়েছে।

কিন্তু এ কী অভাবনীয় কথা?

রাজাসাহেব জানেন এই সব নেমকহারামির কথা? অথচ চুপ করে আছেন? থানা পুলিশ করছেন না? নিজের গায়ে ধুলো পড়বে! কেন?

সিগার টানতে টানতে নিখিলেন্দ্র মনে মনে বিদ্রুপের হাসি হেসে মনে মনেই বলেন, 'কী-গো তুষারকণা দেবী? বড় যে অহঙ্কার দেখিয়ে চলে গিয়েছিলে, এখন? এখন যদি আমি তোমার কাছে গিয়ে বলি, 'খুব উঁচুদরের মানুষ করেছেন তো আপনি আপনার ছেলেদের? শুনতে পাই তারা না কি বংশের পদবীটা পর্যন্ত স্বীকার করে না। সেটা কার শিক্ষায়!···তা' আমি যদি এর প্রতিশোধ নিই?

যদি তোমার ওই চোর ছেলেদের হাতে হাতকড়া পরাই আমার ওই ইঁদুর-ছুঁচো চাকরগুলোর সঙ্গে একসঙ্গে?···না নিখিলেন্দ্র

ভঞ্জচৌধুরী অত নীচ নয়, নোংরা নয়।···তাই সই জালের খবরেও কথাটি কইনি। খবর বাতাসে উড়ে আসে বুঝলে? খবর তারাই সাপ্লাই করে যারা ওই পাপচক্রের সাহায্যকারী।·· হ্যাঁ, প্রথম শুনে রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠেছিল, তারপর হাসছি। নিজের জিনিস নিজে চুরি করার মজায় হাসছি।···হয়ত শুনলে, তুমি বলবে, 'রক্তের দোষ।'···সেটাই যদি যুক্তি হয়, তবে তুমি একফোঁটা একটা মেয়ে নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরীর মুখের ওপর 'মানুষ' করার নমুনার প্রশ্ন তুলে টিট্‌কিরি দিলে কোন সাহসে?···প্রমাণ তো হল, 'মানুষ করার অহংকারটা কিছু নয়।···বড় খুশী হয়েছি আমি তুষারকণা, বড় আহ্লাদিত হয়েছি, তোমার এই অহঙ্কার চূর্ণয়।···জানি আকাশে ধূলো ছুঁড়লে নিজের গায়েই পড়ে, তবু চুপিচুপি নিজের মনে বলছি। ···কিন্তু না। সত্যি কথা বলি, সত্যি খুশী হতে পারছি না তুষারকণা দেবী, কারুর অহঙ্কার চূর্ণ হল দেখতে আমার কষ্ট হয়। আমার ভীষণ মন কেমন করে।···তোমাকে আমি নিজে দেখে ঘরের লক্ষ্মী করে এনেছিলাম, তোমায় ভঞ্জচৌধুরী বংশের 'বধূ মুকুট' দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলাম।···ওই নিরেট পাত সোনার মুকুটটা আমার মা ঠাকুমা মাথায় পরেছিলেন, তোমার শাশুড়ী মাথায় দিয়েছিলেন' তুমিও দিলে। মনে হয়েছিল দেখতে সৌখিন নয় বলে তোমার পছন্দ হয়নি, কারণ তুমি ওর ঐতিহ্যটা বোঝনি।···নিখিলেন্দ্র যেন ওই মনে মনে কথার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলেন।···যেন তুষারকণাকে হাতে পেয়েছেন, তাই যা কিছু বলার বলে চলেছেন।

তুষারকণার ছেলেরাই তাহলে মাকে তুলে দিয়েছে ওই বিচারকের এজলাসে।

কিন্তু বিচারকের চোখে জল!

দৃশ্যটা অভিনব বৈকি!

নিখিলেন্দ্র শুয়ে আছেন, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ছে।

পড়ছে, কারণ ক্রমশঃ আর বিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারছেন না।

এখন বলছেন, 'হ্যাঁ তুষারকণা, তোমার জন্যে আমার মন হাহাকার করছে। কী দুঃখী তুমি, কী দুঃখী!...অথচ তুমি এ সংসারের সর্বময়ী হয়ে থাকতে পারতে, আমার পরম স্নেহের পাত্রী হয়ে থাকতে পারতে।..আমি আমার ছেলেকে শাসন করেছিলাম, সেটা আমার পিতৃঅধিকারের ব্যাপার, তুমি সেটাকে নিজের অপমান বলে গায়ে মেখে নিতে গেলে কেন? কেন ভাবতে গেলে শাসনটা 'তোমার স্বামীকে' করা হল?...'আমার ছেলেকে' করা হল তা ভাবতে পারলে না কেন? ভাবতে পারলে ভাল করতে।...'স্বাধীনতা' যেমন পরম বস্তু, 'সামাজিক পরিচয়'টাও তার থেকে খুব কম নয়

'জানি তোমরা এখনকার ছেলে-মেয়েরা একথা শুনে হাসবে। ওই মিথ্যে প্রতিষ্ঠায় তোমরা বিশ্বাসী নও, কিন্তু ভেবে দেখলে আমাদের সমগ্র জীবনটাই তো মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।...আমাদের তো অনেক সময় অসভ্য হতে ইচ্ছে করে, অভদ্র হতে ইচ্ছে করে, বেপরোয়া উদ্ধত অজ্ঞান হতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সে ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করতে পারা যায় কি? যায় না। কারণ? কারণ আমাদের বিরাট একটা মিথ্যের মধ্যে বাস করতে হয়। আমাদের একটা বংশগত পরিচয় দরকার। সামাজিক চেহারা দরকার। শুধু মাত্র একটা মানুষের চেহারা নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালে কেউ স্বীকৃতি দেবে? অজ্ঞাতপরিচয় শুধু অবজ্ঞাতই নয়, সন্দেহজনক। তবে? এই পরিচয়ের খোলশটা কি মিথ্যা নয়?'

'মামা!'

চমকে তাকালেন নিখিলেন্দ্র।

আবার সেই একা উঠে এসেছে নিরুপমা, আবার সেই ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

'কী কাণ্ড! নীরু আবার একা চলে এসেছিস? যশোদাটা থাকে কোথায়?'

'মামা কারা যেন এসেছে, যশোদাদি সেখানে রয়েছে। আমার বড্ড ভয় করছে মামা!'

'আঃ নীরু, বুড়োবয়েসে এইবার তুই আমার কাছে থাপ্পড় খাবি। ভয় ভয় ভয়! কে এসেছে? কোথা থেকে এসেছে?'

'আমি জানি না মামা, মনে হচ্ছে এরা আপনাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।'

'চমৎকার! তোর মামা যেন একটা মোয়া, তাই তোর হাত থেকে কেড়ে নেবে! কিন্তু এলো কে?'

'আপনি দেখুন গে।'

নিখিলেন্দ্র ভারী গলায় বলেন, 'দেখার দরকার থাকলে তারাই এসে দেখা করবে।'

নিখিলেন্দ্রকে প্রায় চমৎকৃত করে পিছন থেকে একটি মাজাঘসা পুরুষ গলা কথা কয়ে ওঠে, 'দরকার না থাকলে এতদূর পর্যন্ত এসেছেই বা কেন তারা?'

'কে? কে? আমার বিজয়ের গলায় কথা কয়ে উঠল কে?'

নিখিলেন্দ্রকে এমন দিশেহারা হতে কেউ কখনো দেখেনি। না যশোদা, না ব্রজেন, না মদন, না সুখেন, না কাসেম আলী। আশ্চর্য, নিয়মকানুন না মেনে এরা সবাই উঠে এসেছে নিখিলেন্দ্রর দক্ষিণ বারান্দায়। যেখানে বসে তিনি ভঞ্জচৌধুরী বংশের বংশতালিকা তৈরী করছিলেন।

এমন কে এল যে সবাই নিয়ম ভুলে গেল?

নিখিলেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বসলেন। আত্মস্থ হলেন, দণ্ডায়মানদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের

গলায় বললেন, 'এখানে কী 'খেল' দেখানো হচ্ছে হে? তাই এত কালতু লোকের কারবার?'

মুহূর্তে ভোজবাজির মত ভীড় হাওয়া। শুধু নিরুপমা বসে রইল কাঁচের চোখের মত চোখ দুটো মেলে।···ওকে দেখলে কখনো মনে হয় ভগবান ওর ওপর সদয়, তাই শুধু দৃষ্টিটাই কেড়ে নিয়েছেন, সৌন্দর্যটুকু কেড়ে নেননি, কখনো আবার মনে হয় কী নিষ্ঠুর তিনি, তাই এই ঘন কালো বিশাল আর সুন্দর চোখ দুটোর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন।

কিন্তু যারা এসেছে তারা তো জানে না, নিরুপমা কী? নিরুপমা কে? নিরুপমা কেন? তারা অবাক হয়ে দেখছে ছোট মেয়ের মত মুখের দুধারে বেণী ঝুলিয়ে ফর্সা ধবধবে শাদা খোলের শাড়ি পরে বসে থাকা অতবড় মেয়েটা কেমন প্যাঁট প্যাঁট করে তাকিয়ে আছে।

নিখিলেন্দ্রর পরণে আজ সূক্ষ্ম সরু কাশ্মীরি শালের পা পর্যন্ত লুটনো পায়জামা, গায়ে উৎকৃষ্ট কাজের ঘী রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তার উপর চওড়া পাড়ের কল্কাদার শাল। মাথার চুল কুচকুচে কালো, গায়ের চামড়া মসৃণ গোলাপি।

নিখিলেন্দ্রর পিছন থেকে যে কথা বলেছিল, সামনে এসে থমকে চেয়ে থাকল। এমন ভাবেনি। এতখানি আশা করেনি।

নিখিলেন্দ্র পাশাপাশি দাঁড়ানো ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখেন, নিখিলেন্দ্রর কিছু পূর্বের সেই দিশেহারা ভাবটার ছায়া বুঝি একবার চোখে ফুটে ওঠে, কিন্তু সে ক্ষণিক।

নিখিলেন্দ্রর পেটেন্ট বিদ্রুপরঞ্জিত হাসিটির সঙ্গে তেমনি সুরেরই কথা উচ্চারিত হল, 'দেখা করার দরকার থাকলে ভদ্রলোকেরা আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তবে দেখা করতে আসে। নিদেন পক্ষে স্লিপ দিয়ে পরিচয়পত্র পাঠিয়ে—'

ওরা একথার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে এসে পায়ের কাছে নীচু হয়ে নমস্কার করল।

নিখিলেন্দ্র বললেন, 'বুঝলাম এটিকেট-ফেটিকেটের ধার ধারো না। তা যাক এখন তোমাকে এই প্রথম দেখলেও চিনতে আটকাচ্ছে না। বংশের চেহারা ভুল হবার নয়, বয়সের আন্দাজে মনে হচ্ছে কনিষ্ঠটি। কী যেন নাম ছিল তোমার? মনুজেন্দ্র না?···বংশতালিকা প্রস্তুত করছি কিনা, খেয়াল রাখা দরকার হচ্ছে—'

ছেলেটা এখন বেশ সপ্রতিভভাবে বলল, 'নামটা ছিল? কেন? এখন আর নেই নাকি?'

নিখিলেন্দ্রর মুখে এখন বিকেল বেলার আলো, নিখিলেন্দ্রর মুখে কৌতুক ছটা। বলেন, 'শুনতে পাই নাকি 'নামকরণের' উপর সংশোধনের কাঁচি চালিয়ে হালকা হয়ে গেছ।···হালকা যুগে হালকা বুদ্ধি। কিন্তু সে যাক, এই মেয়েটা আবার তোমার সঙ্গে জুটল কী সুবাদে? এই কিছুদিন আগে অন্য আর গোটাকতক ছেলে জুটিয়ে এসে আড্ডা দিয়ে গিয়েছিল না? আবার তোমার স্কন্ধে ভর করল কখন?'

ওরা ঠিক করে এসেছিল, অবস্থা যতই খারাপ হোক, ওরা কিছুতেই রেগে যাবে না। মেজাজের পারা উপরে তুলবে না। তাহলেই কাজ পণ্ড। তাই মনুজ বেশ খোলা গলায় বলে উঠল, 'পেতনী-টেতনীরা যে কখন কার স্কন্ধে ভর করে বসে টের পাওয়া যায় কি?··'

মনে মনে বলল, 'ঠাট্টায় দোষ কী? নাতি ঠাকুর্দা সম্পর্ক তো!'

নিখিলেন্দ্রর মন বুঝি এখন ওই বাপের গলায় কথা বলে ওঠা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার জন্যে উন্মুখ, তাই ওই ধৃষ্টতাকে অবহেলা করে বলেন, 'হুঁ! আর কিছু শিখেছ কিনা জানি না, কথাটি ভালই শিখেছ। তা করা হয় কী? লেখাপড়া করেছ কিছু?'

মনুজ বলল, 'সব কথারই উত্তর দেওয়া যাবে কিন্তু তার আগে বসতে হবে। এটিকেট না জানার কথা তুলেছিলেন, কিন্তু অতিথি এসে পড়লে বসতে বলাও একটা এটিকেট।'

'হুঁ।'

নিখিলেন্দ্র বললেন, 'তাহলে তোমার কাছেই শিখলাম সেটা, এবার বলা হচ্ছে বসুন আপনারা।'

ততক্ষণে শিপ্রা তো বসেই পড়েছে। মনুজও বসে। আর উপস্থিত লোক কটাকে চমকে দিয়ে শিপ্রা প্রথম কথা বলে ওঠে, 'আচ্ছা আপনার চুল এখনো এত কালো আছে কী করে?'

এরপর চমক দিলেন নিখিলেন্দ্র।

হেসে উঠলেন হা-হা করে।

উদার উদাত্ত হাসি।

যারা তখন ভোজবাজির মত মিলিয়ে গিয়ে ধারে কাছে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সাহস করে গলা বাড়াল।

হাসি থামিয়ে নিখিলেন্দ্র মনুজের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের গলাতে বললেন, 'বাঃ! বড় খাসা জানোয়ারটিকে তো জুটিয়েছ ভায়া? পেলে কোথায়? চিড়িয়াখানা থেকে বুঝি?'

মনুজ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে এই চিরঅপরিচিত পরম আত্মীয়টির মুখের দিকে। এখন একেবারে চিরপরিচিত নিকটজনের মত লাগছে।

কী অদ্ভুত আশ্চর্য!

এই মানুষটা সম্পর্কে আজীবন কত বিতৃষ্ণা ছিল, ছিল কত বিরুদ্ধ ধারণা। কোন যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সেগুলো। এখন ওঁকে দেখতে দেখতে মুগ্ধ হতে ইচ্ছে করছে, ভালবাসতে ইচ্ছে করছে, ওই মসৃণ হাত দুটোর উপর হাত বুলোতে ইচ্ছে করছে।

শিপ্রার কাছে কি কৃতজ্ঞ হবে মনুজ?

নিখিলেন্দ্র বললেন, 'তা এই অভাজনের গৃহে মহাজনের পদার্পণ কেন? উদ্দেশ্যটা কী? পাচার করবার মত মালটাল কি আর কিছু

আছে? এতদিনে বোধহয় তোমার অগ্রজদ্বয় সবই ফর্সা করে এনেছেন।'

মনুজ চমকে ওঠে, কেঁপে ওঠে। সে সব তাহলে এঁর অজ্ঞাত নয়। আশ্চর্য, তাতেও এমন নির্বিকার। দাদাদের প্রতি যে দারুণ ঘৃণা পুঞ্জীভূত ছিল তা যেন এই হালকা পরিহাসের হাওয়ায় খানিকটা ঝরে গেল।

গর্হিত একটা দুষ্কর্মকে যে এইরকম অবলীলায় ক্ষমা করে নিয়ে দুষ্কর্মের সমস্ত দৈন্য আর মালিন্য এমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তা কোনদিন ধারণার মধ্যে ছিল না মনুজের।

নিখিলেন্দ্র যেন তাঁর আদুরে নাতিদের বাল্য চাপল্যের দুষ্টুমির কথা বললেন।

মনুজ অভিভূত হল, বিচলিত হল। এযাবৎ এই অপূর্ব সান্নিধ্য থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রেখে এসেছে বলে নিজেদেরকে খুব মূর্খ আর বঞ্চিত মনে হল।

তবু মনুজ ভাঁট দেখাতে ছাড়ে না, বলে, 'আমার কোন উদ্দেশ্য-অভিসন্ধি নেই। যা কিছু সবই এই মহিলার। যা বলার এবার উনিই বলবেন।'

নিখিলেন্দ্র নিরীক্ষণ করে দেখলেন তাঁর সামনের মানুষটাকে। দেখলেন তার মুখে একটি স্থিরতার দীপ্তি।

এ মেয়ে যা ধরবে তা করবে।

বললেন, 'উনিই বলবেন? তা বলুন।'

শিপ্রা উঠে এল, আর একবার প্রণাম করে বলল, 'আমরা আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। দিতে হবে।'

নিখিলেন্দ্র বললেন, 'তা নিতে যখন এসেছ এত কষ্ট করে, তখন দিতেই হবে, কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না এই ফসিল বুড়োটার আশীর্বাদটা এত দামী হল কবে থেকে যে, রেলগাড়ি চড়ে নিতে আসা যায়।'

শিপ্রা মনুজের দিকে তাকিয়ে বলে 'বলি তাহলে ?'

'সত্যি কথা বলবে না কেন ?'

'জানেন, ওকে এই নিয়ে আসার জন্যে কত কোটি কথা খরচ করতে হয়েছে আমায় !'

নিখিলেন্দ্র টেবিলে রাখা কলমটা লুফতে লুফতে বলেন, 'সেটা এঁদের এত দিনের ব্যবহারে অনুমান করছি। শুধু বুঝতে পারছি না তোমার এত দায় পড়ল কেন ? আমি তো তোমাদের জীবনে ছিলাম না কোনদিন ?'

শিপ্রা চটপট বলে উঠল, 'ছিলেন না, এলেন'।

'এলাম ?'

নিখিলেন্দ্রর হা হা হাসি।

'এলাম ? এখন এলাম !'

হাসি থামিয়ে বললেন, 'কিন্তু এ রকম একটা বোকার মত ভুল কেন করলি তোরা ? বিয়েটা সেরে নিয়ে একেবারে 'জোড়ে' এলেই তো ন্যায্য কাজ হত।'

মনুজ গম্ভীরভাবে বলে, 'আমিও তাই বলেছিলাম, সাড়ে পাঁচ টাকা দিয়ে কাজটা চুকিয়ে ফেলে, তারপর আশীর্বাদ আনতে যাওয়া যাক।...তা এই মেয়ের অনেক বায়না, বলে, 'ভাগ্যে যদি আশীর্বাদের বদলে গলাধাক্কা জোটে ? অন্যদের একটা মেয়ে হিসেবে সে অপমান সইবে, বংশের বৌ হয়ে এলে সইবে না।'

'এই কথা বলেছে ?'

নিখিলেন্দ্রর কথায় যেন একটা অভিভূত আনন্দ ঝরে পড়ে। আস্তে বলেন, 'পারবে। এই মেয়েই পারবে।'

তারপর হঠাৎ চুপ করে যান।

সমস্ত পরিবেশটা স্তব্ধ হয়ে যায়।

শীতশেষের সন্ধ্যা এসে পড়ে একটু ইতস্ততঃ করছে পুরোটা পড়তে।

হঠাৎ এই স্তব্ধতা ভেঙ্গে নিরুপমার আবেগকাতর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'মামা! এরা কে? এরা কেন এসেছে? আমায় কিছু বলছেন না কেন?'

নিখিলেন্দ্র গভীর স্নেহের গলায় বলেন, 'বলব রে সব বলব। কত কথা বলার আছে, কাকে বলে যাব ভেবে ভেবে মরাই হচ্ছে না।··· এইবার আশা হচ্ছে মরতে পারি। এতদিনে সে অধিকার পেয়ে গেলাম বোধ হয়।···কিন্তু ব্যাপার কি? এ ব্যাটারা কি? এদের একটু চাও দিচ্ছে না—সবাই একসঙ্গে মরেছে নাকি?···ব্রজেন! সুখেন!'

নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরীর গলা গম গমিয়ে ওঠে।

বহু বহুদিন পরে আজ নিখিলেন্দ্র তাঁর পাঁচ পুরুষের স্মৃতিমণ্ডিত এই বিরাট প্রাসাদের সব জায়গায় পা ফেললেন, সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখালেন ওদের।···

বললেন, 'এই মেয়েটা সেদিন রাজবাড়ী দেখতে চেয়েছিল, দেখানো হয় নি, দেখিয়ে দিই মনুজ! নইলে আবার এর মান হতে পারে।'

শিপ্রা বিভোর বিহ্বল হয়ে ঘোরে ওঁর সঙ্গে, পিছনে মনুজ। অলক্ষ্যে বলেছে, 'আমার ভূমিকাটা দেখছি তাম্বুলকরঙ্কবাহীর!'

'থামো চুপ কর,' শিপ্রা আচ্ছন্ন গলায় বলে, 'অনুভব করতে চেষ্টা কর তুমি এই বাড়ীর, এই বংশের। ওই পাঁচ পুরুষের পরবর্তী পুরুষ!'

'এই হচ্ছে নাচঘর!'

হলের মধ্যে এসে পা ফেললেন নিখিলেন্দ্র, বললেন, 'এই ঘর বংশের পতনের সাক্ষী। এর দেওয়ালে দেওয়ালে অনেক ইতিহাস।··· এই হচ্ছে অস্ত্রাগার। ;···এ ঘরটায় বোধহয় এখনো ব্রজেন

কোম্পানীর চোখ পড়েনি। তাই দেওয়ালে দেওয়ালে ঢাল-তলওয়ার ট্যাঙ্গী, কান্দি, মায় পূর্বকালের তীর-ধনুক পর্যন্ত এখনো রয়েছে।...'

মদন ঘোষ নীরবে নতমুখে চলেছে এদের সঙ্গে, চাবি বন্ধ ঘর-দালানের দরজা খুলে খুলে মেলে দিচ্ছে। ওর কাছেই সব চাবি!

নিখিলেন্দ্র ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, 'এ ঘরটায় বুঝি হাত দিতে সাহস হয় নি, তাই না মদনবাবু? ভয় হচ্ছিল ওই অস্ত্র-শস্ত্রগুলো যদি নিজের জায়গা ছেড়ে নেমে আসে? যদি বলে ওঠে, 'ওহে মদনলাল, এইবার আর নিষ্কৃতি নেই তোমার! এসো এক হাত হয়ে যাক।' নিশ্চয় তাই, নইলে এসব পুরনো আমলের তামা পেতল লোহা ব্রোঞ্জ এ সবেরও আজকাল বাজারদর কম নয়।'

আবার সেই হা হা হাসি হেসে ওঠেন।

বিরাট উঁচু আর প্রায় জানলা-দরজাহীন এই ঘরে ওই হাসিটা যেন ধাক্কা খেয়ে আছড়ে আছড়ে পড়ে।

'দাদু, আজ আর থাক্ না।'

মনুজ বলে, 'এত ঘুরতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। আমাদেরই তো পা ব্যথা করছে।'

নিখিলেন্দ্র বললেন, 'আমার করছে না। অনেক দিন পরে আজ এত বেড়াচ্ছি। ভারী ভাল লাগছে।'

'আচ্ছা দাদু', লাইব্রেরীর সামনের দালানে এসে বলে ওঠে মনুজ, 'পয়সা হলেই লোকে এত বোকা হয়ে যায় কেন বলুন তো? এত বড় বাড়ী বানায় যে, মানুষ হেঁটে ফুরতে পারে না, সত্যিই কি এত দরকার হয়?'

নিখিলেন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়েন, বলেন, 'দরকারের কি কোন সীমা আছে রে? দরকারের শেষ হিসেব কসতে কসতে যদি নেমে আসিস তো সাড়ে তিন হাত জমি, এক টুকরো কানি, আর এক মুঠো ভাত,

এইতে এসে ঠেকে।···কিন্তু তবে আর মানুষের সঙ্গে পশুপক্ষীর তফাৎ কোথায় রইল বল? মানুষের কাজই হচ্ছে দরকার 'বাড়িয়ে' চলা, আর দরকারের অতিরিক্ত গড়ে তোলা। তোদের একালের কথা বেশী বুঝি না, আমার মা বলতেন, 'বাহুল্যই লক্ষ্মী', কথাটায় আমার বিশ্বাস আছে।'

চাবির তোড়া হাতে মদনের ক্লান্ত স্বর শোনা যায়, 'রাজাসাহেব, এসব ঘর না হয় আজ থাক। আপনার শরীর খারাপ হবে। দাদাবাবু তো কাল সকালেও আছেন।'

নিখিলেন্দ্র আবার হেসে ওঠেন। 'এ ঘর, রাজাসাহেব দেখতে চাইলে একটু অসুবিধে আছে, না হে মদন ঘোষ?···তবে থাক্ থাক্। বলা যায় না, যদি আলমারির ফাঁকা তাকগুলো সইতে না পারি। ···চলহে নাতিসাহেব চল। তোমার ভাবী মহারাণীকে আমার অতীত মহারাণীর মহলটা দেখিয়ে দিই।'

শোবার ঘর, বসবার ঘর, পূজোর ঘর, সাজের ঘর, সবটা মিলিয়ে একটা মহল।

নিখিলেন্দ্র ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'কতকাল পরে এ মহলে এসে ঢুকলাম! শুনতে পাই চোরের হাত পড়েছে, তলে তলে সিঁদকাটা চলছে, তবু স্মৃতির এই হীরে মুক্তো পান্না মোতিগুলো কাকে দেখাব, কার হাতে দিয়ে যাব, এই ভেবে ভেবে মরার মতন একটা জরুরী কাজও স্থগিত রেখে দিয়েছি।'

শিপ্রা অভিভূতের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ঐশ্বর্যের আর বিলাসিতায় পরিচয়বাহী পরিত্যক্ত শ্রীহীন বিরল এই কক্ষসভার দিকে। এ যেন একবার কোনো পরমা রূপসীর বার্দ্ধক্যের বলী রেখাঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করা—কেমন ছিল এই সুখ যৌবনে!

অনেক রাতে যেমন পশ্চিমের বারান্দায় এসে বসা হয়, তেমনি

বসেছেন নিখিলেন্দ্র।···অদূরে নিরুপমা তার আসনে, শুধু আজ আর দুটো নতুন আসনে নতুন অতিথি দুজন।

আজ আর আগুন নিভে যায় নি, আস্তে আস্তে মৌজ করে আলবোলা টানছেন।

নিখিলেন্দ্র বললেন, 'এইবার বলি নিরু, এসেছে তোর ভাইপো। বিজয়ের ছোট ছেলে। যখন দেখতে-টেখতে পেতিস, বৌরাণীকে দেখেছিস তো? দনুজ অনুজকেও মনে থাকতে পারে! এটা ছোট। যখন চলে গেছল, ভাল করে হাঁটতে শেখে নি, এখন একেবারে বৌ সঙ্গে নিয়ে—'

নিরুপমা অবাক গলায় বলে 'বৌ?'

'ওই হল! হবু বৌ! কী সুখের কালই হয়েছে, দেখেছিস তো? সেকালে 'বিয়ে করা বৌ নিয়েই বেড়ানো নিন্দের ছিল, আর এখন—হবু বৌ নিয়েই স্বর্গমর্ত ঘুরছে!'

নিরুপমা আস্তে বলে, 'কবে বিয়ে হবে মামা?'

'তা তো জানি না।' নিখিলেন্দ্র বলেন, 'কী রে কবে?'

'হলেই হল একদিন।'

'মামা, কতদিন বাড়ীটা বিয়েবাড়ী হয় নি, খুব ঘটা হোক না।'

এ প্রস্তাবে শিপ্রা অলক্ষ্যে মনুজকে চিমটি কাটে।

নিখিলেন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, 'তাহলে তোর খুব মজা লাগবে, না?'

'হ্যাঁ মামা! আমি নতুন কনের সায়ার লেস বুনব!'

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'দেখছ তো নাতিসাহেব, তোমার পিসিটি কত তাড়াতাড়ি ভাবতে পারে?···কিন্তু আরে, পিসিকে প্রণাম করলিনে মনুজ? দেখতে অমন বর্ণচোরা, তোর থেকে বয়েসে অনেক বড়।'

নিরুপমা প্রণামে আপত্তি জানায়, তবু ওরা করে।

নিরুপমা অনুভবে শিপ্রার হাতটা ধরে বলে ওঠে, 'এ কি তোমার হাত খালি?'

এরা এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে নিরুপমা দৃষ্টিশক্তিহীন।

শিপ্রা মৃদু হেসে বলে, 'রেলগাড়ীতে আসা, যা দিনকাল আজকাল—'

কথাটা অবশ্য বানানো।

ঘড়ি ছাড়া কিছু পরেই না কোনদিন।

নিরুপমা ওর হাতটা নিজের কোলের উপর রেখে আস্তে নিজের নিটোল হাতে দু গাছি চুড়ির সঙ্গে যে ঝিকঝিকে সরু বালা দুটি পরা ছিল, তা খুলে নিয়ে শিপ্রাকে পরিয়ে দেয়।

শিপ্রা অবশ্য 'এ কি করছেন' বলে হাত টেনে নিয়েছে, নিরুপমা সংক্ষেপে দৃঢ় স্বরে বলেছে 'তা' হোক। হাত খালি কি বিশ্রী। আমি তো আর মুখ দেখে কিছু দিতে পারব না, না হয় হাত দেখেই—' হাসল একটু, 'বেশ নরম হাত তোমার। বেশ ভাল মানিয়েছে না মামা?'

নিরুপমার কথার মধ্যে যে একটা সরলতা আছে, তা সকলকে মুগ্ধ করে।

এরপর হঠাৎ উঠল এই বাড়ীর কথা। মনুজ বলল, 'যাই বলুন, এই বিরাট বাড়ীকে একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে রেখে দেওয়ার কোন মানেই হয় না। আপনিই বলুন, 'কোন মানে হয়?'

নিখিলেন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, 'ব্যক্তি' মানুষগুলো যখন ছিল, মানে ছিল। কত আত্মীয় অনাত্মীয়, কত আশ্রিত প্রতিপালিত হত—'

'সে সব তো আর নেই!'

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'আর হয় না, না রে?'

'পাগল! আপনি রাখতে চাইলেই কি কেউ আশ্রিত হয়ে থাকতে চাইবে?'

'তা বটে।'

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'তবে পরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিস—

'রাজবাড়ী ভাঙ্গা হইতেছে। আসল মার্বেল টাইলস ও উচ্চ মানের সেগুন কাঠের দরজা জানলা বিক্রয় হইবে।'

মনুজ বলে, 'বাঃ তা কেন? পাবলিকের জন্যে কিছু করা যায়। যেমন ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল—নার্সদের শিক্ষণ শিবির।'

'তা তাই হোক। একটা মেয়েদের স্কুল খুলে দে, আর নিরুপমাকে তার গিন্নি করে দে!'

'চমৎকার! আমি যেন সব করে দেবার কর্তা!' বলল মনুজ।

'হতে কতক্ষণ?'

নিখিলেন্দ্র হেসে উঠে বলেন, 'খোদা যব দেতা, তব ছাপ্পর ফোঁড়কে দেতা'···আচ্ছা এবার তোমরা শুয়ে পড়গে। নিরু, তোমার এই বৌমাকে তোমার মহলে নিয়ে যাও। মনুজ, তোমার যেখানে পছন্দ।'

'আমার তো ওই দালানের সোফাটায় হলেই যথেষ্ট।'

'ঠিক আছে।···যশোদা!'

শিপ্রা বলে ওঠে 'বাঃ আপনি কখন ঘুমোবেন?'

নিখিলেন্দ্র বলেন, 'ঘুমবো, ঘুমোবো। আমার সব কাজ টাইম-মাফিক। এখন আমি যতক্ষণ ইচ্ছে জঙ্গল দেখব, তারপর—'

'জঙ্গল দেখবেন?'

শিপ্রার এই বিস্ময় প্রশ্নে নিরুপমা বলে, 'তাইতো অভ্যাস মামার। ঘুমের আগে অনেকক্ষণ ওই জঙ্গলটা দেখেন।'

'রাত্তিরে বসে বসে আপনার জঙ্গল দেখতে ইচ্ছে করে দাদু?'

'করে দাদুভাই! ওই জঙ্গলে যেন আমার নাড়ির টান। বাঘ-ভালুক ছিলাম বোধ হয়।'

হেসে ওঠেন, ওরা চলে যায়।

আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই।

শিপ্রা নিরুপমার ঘরে, মনুজ সত্যিই বারান্দায় সোফায়।···

ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ওদের।

এ শব্দ কিসের?

ভয়ঙ্কর একটা বিপদবাহী মনে হচ্ছে।

জঙ্গলে কি কেউ বাঘ শিকার করতে গেছে? কিন্তু জঙ্গলে গুলি ছুঁড়লে কি এত দূর ব্যবধানে বাড়িরই ভিৎ নড়ে ওঠে?

নাঃ, জঙ্গলে নয়।

জঙ্গলে না গিয়েই শৌখিন একটা শিকার করে ফেলেছেন, অনেক বাঘভালুক বনবরা বুনোমোষ চিতা নেকড়ে শিকার করে হাত পাকানো শিকারিটি।

এ শিকারের রক্ত ধুলো মাটি শুকনো ঘাসেরা পান করল না, পান করে নিয়েছে ভেলভেটের গদি।

ওরা এসে দেখল—

নিখিলেন্দ্র ভঞ্জচৌধুরী পড়ে আছেন উপুড় হয়ে, কিন্তু মাথার কাছে খোলা পড়ে আছে তাঁর সেই কৌতুকের ঝিলিক-লাগানো হাসিটি।

'মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' একথা তো লিখতেই হবে, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান একটা লোককে— তার সঙ্গেই লিখে রেখেছেন, 'কীহে? কেমন জব্দ করে গেলাম? 'জরুরি কাজ আছে, বলে মড়াটাকে ফেলে রেখে পালাতে পারবে তার মুখে আগুন না দিয়ে?···নাও এখন এই বাড়ি, এই জিনিসপত্তর, এই স্মৃতির সমুদ্র নিয়ে কী করবে কর?·· আমি এই কেটে পড়লাম তোমাদের কলা দেখিয়ে।···এতকাল বেঁচে থাকতে থাকতে লজ্জা এসে গিয়েছিল। অথচ ফাঁক পাচ্ছিলাম না কেটে পড়বার। অতএব তোমাদের কোটি কোটি সেলাম।···নিরুর জন্যে আর ভাবনা রইল না, একটা নিরীহ অন্ধ বিধবা মেয়েকে

তোমরা অবহেলা করতে পারবে না, এ প্রতিশ্রুতি দেখতে পেয়েছি তোমাদের চোখে মুখে।.....

গুড্‌বাই!

দাদু।'

৺নিখিলেন্দ্রনাথ ভঞ্জচৌধুরী

———